স্বাধীন বাংলাদেশ (১৯৭১-২০০৫ খ্রিঃ)

ভূমিকা

মুক্তিযুদ্ধের মধ্য দিয়ে ১৬ ডিসেম্বর ১৯৭১ সালে স্বাধীন বাংলাদেশের অভ্যুদয় ঘটে। বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমান ১৯৭২ সালের ৮ জানুয়ারি পাকিস্তানের কারাগার থেকে মুক্ত হয়ে ১০ জানুয়ারি স্বাধীন বাংলাদেশে প্রত্যাবর্তন করেন। বঙ্গবন্ধুর নেতৃত্বে সরকার প্রথমেই দেশ পরিচালনার জন্য সংবিধান প্রণয়নের কাজে হাত দেয়। ১৯৭২ সালের ১৬ ডিসেম্বর বঙ্গবন্ধু সরকার দেশের প্রথম সংবিধান গ্রহণ করে। বঙ্গবন্ধুর গতিশীল নেতৃত্বে তৎকালীন আওয়ামী লীগ সরকার একটি সংবিধান প্রবর্তন ও দেশ পুর্নগঠনে উদ্যোগ নিয়ে পুরোদমে এগিয়ে যাচ্ছিল। ঠিক সেই সময়ে পাকিস্তানি দর্শনের অনুসারী সেনাসদস্যের হাতে ১৯৭৫ সালের ১৫ আগস্ট বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমান শহীদ হন। এরপর খন্দকার মোশতাক আহমদ রাষ্ট্রপতি হন। এ সময় সামরিকবাহিনীতে অভ্যুত্থান ও পাল্টা অভ্যুত্থানের একটা পর্যায়ে মেজর জেনারেল জিয়াউর রহমান ক্ষমতা দখল করেন। চট্টগ্রাম সফরকালে সামরিক বাহিনীর একদল অফিসারের হাতে রাষ্ট্রপতি জিয়াউর রহমান ১৯৮১ সালের ৩০ মে নিহত হন। পরবর্তী এক বছরের মধ্যে রাষ্ট্রপতি আবদুস সাত্তারকে ক্ষমতাচ্যুত করে সেনা প্রধান হুসেইন মোহাম্মদ এরশাদ ক্ষমতা দখল করে। দীর্ঘ ৯ বছর শাসনের পর ১৯৯০ সালের ডিসেম্বর মাসে এক গণঅভ্যুত্থানে এরশাদ সরকারে পতন ঘটে। প্রধান বিচারপতি শাহাবুদ্দীন আহমদের নেতৃত্বাধীন অস্থায়ী সরকারের অধীন ১৯৯১ সালের ২৭ ফেব্রুয়ারি জাতীয় সংসদ নির্বাচন অনুষ্ঠিত হয়। এই জাতীয় সংসদ নির্বাচনে বেগম খালেদা জিয়ার নেতৃত্বে বাংলাদেশ জাতীয়তাবাদী দল (বি.এন.পি) সংখ্যাগরিষ্ঠতা অর্জন করে ক্ষমতা গ্রহণ করে এবং ১৯৯১ সালের ৬ আগস্ট জাতীয় সংসদে দ্বাদশ সংশোধনী বিল গৃহীত হওয়ার সঙ্গে সঙ্গে বাংলাদেশে সংসদীয় শাসন ব্যবস্থার শুরু হয়।

১৯৭২ খ্রিস্টাব্দে বাংলাদেশের প্রথম সংবিধান প্রণয়ন

উদ্দেশ্য

এই পাঠ শেষে আপনি —

- স্বাধীন বাংলাদেশের সংবিধান প্রণয়নের ইতিহাস বলতে পারবেন
- সংবিধান সম্পর্কে বিবরণ দিতে পারবেন।
- কেন বাংলাদেশের সংবিধান অন্যদেশের থেকে ভিন্ন মূল্যায়ন করতে পারবেন।
- ১৯৭২ সালের সংবিধানের বৈশিষ্ট্যগুলি ব্যাখ্যা করতে পারবেন।
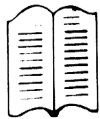
সংবিধান বা শাসনতন্ত্র হলো একটি রাষ্ট্রের সর্বোচ্চ আইন। একটি স্বাধীন ও সার্বভৌম রাষ্ট্রের সরকার কীভাবে গঠিত ও পরিচালিত হবে সে সম্পর্কে বিভিন্ন নির্দেশনার সমষ্টিই সংবিধান। সংবিধানে সরকার গঠন এবং সরকারের তিনটি বিভাগ– শাসন বিভাগ, আইন বিভাগ ও বিচার বিভাগের মধ্যে সম্পর্ক ও ক্ষমতার এখতিয়ার নির্ধারণ করে দেওয়া হয়।

বাংলাদেশ অস্থায়ী সাংবিধানিক আদেশ জারি

স্বাধীন বাংলাদেশের সংবিধান প্রণয়নের প্রক্রিয়া

১৯৭১ সালের ১৬ ডিসেম্বর পাকিস্তানি বাহিনীর হাত থেকে বাংলাদেশ রাজনৈতিক মুক্তি অর্জন করে। মুক্তিযুদ্ধের সূচনালগ্নে গঠিত বাংলাদেশ সরকারের রাষ্ট্রপতি ছিলেন বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমান। কিন্তু বাংলাদেশের সরকার ব্যবস্থার ধরণ কী হবে সে সম্পর্কে কোনো সিদ্ধান্তগ্রহণ করা হয়নি। তৎকালীন আওয়ামী লীগ সরকার বাংলাদেশের সংবিধান প্রণয়নের লক্ষ্যে ১৯৭২ সালের ১১ জানুয়ারি 'বাংলাদেশ অস্থায়ী সাংবিধানিক আদেশ' জারি করে। আদেশে বলা হয়, বাংলাদেশে সংসদীয় গণতন্ত্র প্রতিষ্ঠা হবে এবং প্রধানমন্ত্রীর নেতৃত্বে একটি মন্ত্রিসভা থাকবে। এই আদেশে আরো বলা হয় একটি পূর্ণাঙ্গ সংবিধান প্রবর্তিত না হওয়া পর্যন্ত মন্ত্রিসভা বাংলাদেশের একজন নাগরিককে রাষ্ট্রপতি মনোনীত করবেন।

বাংলাদেশ অস্থায়ী সাংবিধানিক আদেশে জারি

বাংলাদেশের প্রথম গণপরিষদ

বাংলাদেশের সংবিধান রচনার জন্য রাষ্ট্রপতি বঙ্গবন্ধু শেখ মজিবুর রহমান ১৯৭২ সালের ২৩ মার্চ 'বাংলাদেশ গণপরিষদ আদেশ' জারি করেন। এই আদেশে পূর্ব পাকিস্তান থেকে ১৯৭০ ও ১৯৭১ সালের জানুয়ারি মাসের নির্বাচনে নির্বাচিত সকল সদস্য যারা পাকিস্তান জাতীয় পরিষদে ও পূর্ব পাকিস্তান প্রাদেশিক পরিষদে নির্বাচিত হয়েছিলেন তাদের নিয়ে গণপরিষদ গঠিত হয়। বাংলাদেশের জন্য সংবিধান প্রণয়নই ছিল গণপরিষদের একমাত্র কাজ। এই আদেশটি ১৯৭১ সালের ২৬ মার্চ থেকে কার্যকর করা হয়।

এই আদেশ জারির মধ্য দিয়ে সংবিধান প্রণয়নের আনুষ্ঠানিক কাজ শুরুহয়। আওয়ামী লীগ পার্লামেন্টারি পার্টি বঙ্গবন্ধুকে গণপরিষদের দলীয় নেতা নির্বাচন করে। ৪৩০ সদস্য বিশিষ্ট গণপরিষদের প্রথম অধিবেশন ১৯৭২ সালের ১০ এপ্রিল ঢাকায় অনুষ্ঠিত হয়। এই অধিবেশন ছিল দুই দিনব্যাপী। প্রথমদিনে স্পিকার ও ডেপুটি স্পিকার নির্বাচনসহ গণপরিষদের কার্যপ্রণালীবিধি গৃহীত হয়। বিনা প্রতিদ্বন্দ্বিতায় গণপরিষদের প্রথম স্পিকার নির্বাচিত হন শাহ আবদুল হামিদ এবং ডেপুটি স্পিকার পদে নির্বাচিত হন মোহাম্মদ উল্লাহ।

খসড়া সংবিধান প্রণয়ন কমিটি গঠন

খসড়া সংবিধান প্রণয়ন কমিটির কার্যক্রম

সংবিধান একটি রাষ্ট্রের সর্বোচ্চ দলিল। এই দলিল লিখিত বা অলিখিত হতে পারে। বাংলাদেশের সংবিধান একটি সু-লিখিত দলিল। দীর্ঘ সংগ্রাম, ত্যাগ আর রক্তের বিনিময়ে বাংলাদেশের জনগণ এই সংবিধান লাভ করে। এখানে উল্লেখ্য, ভারত ও পাকিস্তান ১৯৪৭ সালের স্বাধীনতা অর্জন করে। কিন্তু স্বাধীনতার দুই বছরের মাথায় ভারত সংবিধান প্রণয়নে সফল হলেও পাকিস্তানের সময় লেগেছে নয় বছর, তাও তা কার্যকর হয় নি। অপরপক্ষে মাত্র নয় মাসে সদিচ্ছা, আন্তরিকতা আর জনগণের কাছে দেওয়া প্রতিশ্রুতির প্রতি সৎ থেকে সংক্ষিপ্ততম সময়ে বিশ্বের অন্যতম শ্রেষ্ঠ সংবিধান প্রণীত হয়েছে বঙ্গবন্ধুর সরকারের নেতৃত্বে।
গণপরিষদ অধিবেশনের দ্বিতীয় দিনে আইনমন্ত্রী ড. কামাল হোসেনের নেতৃত্বে ৩৪ সদস্যের একটা খসড়া সংবিধান প্রণয়ন কমিটি (Draft Constitution Committee) গঠিত হয়। ড. কামাল হোসেনের নেতৃত্বাধীন কমিটি মোট ৭৪টি বৈঠক মিলিত হয়। কমিটি ১৯৭২ সালের ১০ জুন অনুষ্ঠিত সভায় সংবিধানের প্রাথমিক খসড়া অনুমোদন করে। খসড়া সংবিধান নিয়ে

আলোচনা পর্যালোচনা শেষে ১১ অক্টোবর কমিটির শেষ সভায় সংবিধানের পূর্ণাঙ্গ খসড়া চূড়ান্ত অনুমোদন দেয়া হয়।

গণপরিষদের দ্বিতীয় অধিবেশন ও খসড়া সংবিধান চূড়ান্তভাবে গ্রহণ

গণপরিষদের দ্বিতীয় অধিবেশন ১৯৭২ সালের ১২ অক্টোবর অনুষ্ঠিত হয়। ড. কামাল হোসেন এই অধিবেশনে খসড়া সংবিধানটি বিল আকারে পেশ করেন। উপস্থাপিত সংবিধানের ওপর বিভিন্ন রাজনৈতিক দল, ছাত্র সংগঠন ও বুদ্ধিজীবীগণ সংবিধান সম্পর্কে স্ব স্ব অভিমত ব্যক্ত করে। সংবিধান বিলের উপর গণপরিষদে ১৯ অক্টোবর থেকে শুরু করে ৩০ অক্টোবর পর্যন্ত সাধারণ আলোচনা অব্যাহত থাকে। সাধারণ আলোচনায় ১০টি সংশোধনী গৃহীত হয়। এছাড়া খসড়া সংবিধানের ওপর আরো বেশকিছু সংশোধন আনা হয়। সংবিধান বিলের ওপর দ্বিতীয় পর্যায়ের আলোচনা ৩১ অক্টোবর শুরু হয়ে ৩ নভেম্বর পর্যন্ত চলে। এ পর্যায়ে সংবিধানের বিভিন্ন ধারার ওপর বিস্তারিত আলোচনা হয়। এই আলোচনাগুলি অধিকাংশ ছিল ভাষাগত ত্রুটি-বিচ্যুতি, সংবিধানের মৌলিক বিষয় সংক্রান্ত নয়। সংবিধানের চূড়ান্ত পাঠ শুরু হয় ১৯৭২ সালের ৩ নভেম্বর । অতঃপর ১৯৭২ সালের ৪ নভেম্বর গণপরিষদের সদস্যদের তুমুল হর্ষধ্বনী করতালির মধ্যে "গণপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশের সংবিধান" গণপরিষদ কর্তৃক পাস এবং চূড়ান্তভাবে গৃহীত হয়। ১৯৭২ সালের ১৬ ডিসেম্বর প্রথম বিজয় দিবস হতে বাংলাদেশ সংবিধান কার্যকর হয় এবং সেদিন থেকে গণপরিষদ ভেঙ্গে দেয়া হয়। বাংলাদেশ স্বাধীন হওয়ার একবছরের কম সময়ের মধ্যে জাতি একটি পূর্ণাঙ্গ সংবিধান লাভ করে। গণপরিষদের সংবিধানের উপর বক্তব্য রাখতে গিয়ে বঙ্গবন্ধু বলেন, 'এই সংবিধান শহীদের রক্তে লিখিত, এ সংবিধান সমগ্র জনগণের আশা-আকাঙ্ক্ষার মূর্ত প্রতীক হয়ে বেঁচে থাকবে।' বঙ্গবন্ধুর সরকার মাত্র দশ মাসে বাংলাদেশকে একটি সংবিধান উপহার দিতে সক্ষম হয়। এটি বঙ্গবন্ধু সরকারের বড় সফলতাগুলোর মধ্যে অন্যতম।

১৯৭২ সালের সংবিধানের বৈশিষ্ট্য

গণপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশের ১৯৭২ সালে হলো একটি সু-লিখিত দলিল। বাংলা ও ইংরেজি উভয় ভাষায় সংবিধান রচিত হয়। তবে বাংলাকে মূল ভাষা হিসেবে গ্রহণ করা হয়। এই সংবিধানে একটি প্রস্তাবনা, ১১টি ভাগ, ১৫৩টি অনুচ্ছেদ এবং ৪টি তফসিল ছিল।

সংবিধানের প্রথম ভাগে প্রজাতন্ত্রের বৈশিষ্ট্যসমূহ, দ্বিতীয় ভাগে রাষ্ট্র পরিচালনার মূলনীতিসমূহ, তৃতীয় ভাগে মৌলিক অধিকারসমূহ, চতুর্থ ভাগে নির্বাহী বিভাগ, পঞ্চম ভাগে জাতীয় সংসদ, ষষ্ঠ ভাগে বিচার বিভাগ, সপ্তম ভাগে নির্বাচন, অষ্টম ভাগে মহা-হিসাব নিরীক্ষণ ও নিয়ন্ত্রক, নবম ভাগে কর্ম কমিশন, দশম ভাগে সংবিধান সংশোধন এবং একাদশ ভাগে বিবিধ বিষয়াবলি আলোচনা করা হয়েছে।

১. **সর্বোচ্চ আইন:** গণপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশের সর্বোচ্চ আইন হলো সংবিধান। তাই সংবিধানের সঙ্গে সামঞ্জস্যহীন কোনো আইন প্রণয়ন করা যাবে না। সংবিধানে ঘোষণা করা হয়েছে প্রজাতন্ত্রের সকল ক্ষমতার মালিক জনগণ। কেবল সংবিধানের অধীনে থেকে জনগণের পক্ষে সে ক্ষমতা প্রয়োগ করা যাবে।

২. **রাষ্ট্র পরিচালনার মূলনীতি:** সংবিধানের প্রস্তাবনায় চারটি আদর্শকে গ্রহণ করা হয় রাষ্ট্র পরিচালনার মূলনীতি হিসেবে। এ প্রসঙ্গে সংবিধানে উল্লেখ করা হয়– '.... যে সকল মহান আদর্শ আমাদের বীর জনগণকে জাতীয় মুক্তিসংগ্রামে আত্মনিয়োগ ও বীর শহীদদিগকে

প্রাণোৎসর্গ করিতে উদ্বুদ্ধ করিয়াছিল জাতীয়বাদ, গণতন্ত্র, সমাজতন্ত্র ও ধর্মনিরপেক্ষতা- সেই সকল আদর্শ এই সংবিধানের মূলনীতি হইবে।'

ক. জাতীয়বাদঃ পাকিস্তান আমলের ধর্মভিত্তিক জাতীয়তাবাদ মুক্তিযুদ্ধের মধ্য দিয়ে বাতিল হয়ে যায়। এর বিপরীতে ভাষা ও সংস্কৃতিকে কেন্দ্র করে বাঙালি জাতীয়তাবাদের জন্ম হয়। অসাম্প্রদায়িক চেতনা হলো বাঙালি জাতীয়তাবাদের ভিত্তি।

খ. সমাজতন্ত্রঃ বঙ্গবন্ধু তাঁর রাজনৈতিক জীবনে সব সময় সাধারণ মানুষের অর্থনৈতিক মুক্তির কথা বলেছেন। দুঃখী মানুষের মুখে হাসি ফোটানোর জন্য সংগ্রাম করেছেন। মুক্তিযোদ্ধাদের একটা বড় অংশ ছিল নিম্নবিত্ত পরিবারের সন্তান। স্বাধীনতার পর দেশের মানুষের স্বপ্ন ছিল সামাজিক-অর্থনৈতিক ক্ষেত্রে মৌলিক চাহিদা পূরণে রাষ্ট্র প্রয়োজনীয় ব্যবস্থা নেবে। তাই সংবিধানে সমাজতন্ত্রকে রাষ্ট্র পরিচালনার মূলনীতি হিসেবে গ্রহণ করা হয়। মূলত মানুষের ওপর মানুষের শোষণহীন সমাজ গঠনের জন্য সমাজতান্ত্রিক অর্থনৈতিক ব্যবস্থা চালু করাই ছিল এর লক্ষ্য।

গ. গণতন্ত্র : পাকিস্তান রাষ্ট্রের নাগরিক হিসেবে এই অঞ্চলের জনগণ ১৯৪৭ থেকেই কোনো গণতান্ত্রিক অধিকার পায় নি। সংবিধানের উল্লেখ করা হয়, বাংলাদেশ রাষ্ট্রটি হবে একটি গণতান্ত্রিক প্রজাতন্ত্র। রাষ্ট্রে প্রতিটি নাগরিকের মৌলিক মানবাধিকার ও স্বাধীনতার নিশ্চয়তা থাকবে। নির্বাচিত জনপ্রতিনিধির মাধ্যমে প্রশাসন পরিচালিত হবে।

ঘ. ধর্মনিরপেক্ষতা : সংবিধানে ধর্মনিরপেক্ষতার অর্থ ছিল সাম্প্রদায়িকতা পরিহার করা। কোনো ধর্মকে রাজনৈতিক মর্যাদা দান না করা। রাজনৈতিক উদ্দেশ্যে ধর্মকে ব্যবহার করা যাবে না। রাষ্ট্র কোনো ধর্মকে পৃষ্ঠপোষকতা প্রদান করবে না। প্রতিটি নাগরিকের ধর্মীয় অধিকার ও আচার-অনুষ্ঠান পালনের স্বাধীনতার নিশ্চয়তা দেবে রাষ্ট্র।

৩. মৌলিক অধিকার : নাগরিকের ব্যক্তিত্ব বিকাশের জন্য কিছু অধিকারের নিশ্চয়তা থাকা জরুরি। যাতে করে ব্যক্তি স্বাধীনতায় কেউ হস্তক্ষেপ করতে না পারে। তাই সংবিধানে মৌলিক অধিকারসমূহকে অলঙ্ঘনীয় ও পবিত্র বলে ঘোষণা করা হয়েছে।

৪. এককেন্দ্রিক সরকার : এই সংবিধান অনুযায়ী বাংলাদেশে এককেন্দ্রিক শাসনব্যবস্থা প্রবর্তন করা হয়। বাংলাদেশে কোনো প্রদেশ বা অঙ্গরাজ্য নেই। কেন্দ্রীয় সরকারের অধীনে সারা দেশের প্রশাসন পরিচালিত হয়।

৫. মন্ত্রিপরিষদ শাসিত সরকার : সংবিধানে মন্ত্রিপরিষদ শাসিত সরকারব্যবস্থা গ্রহণ করা হয়। এই ব্যবস্থায় মন্ত্রিপরিষদকে সংসদের নিকট দায়ী থাকতে হয়। রাষ্ট্রপতি শাসনতান্ত্রিক প্রধান। তবে রাষ্ট্রের সকল নির্বাহী ক্ষমতা প্রধানমন্ত্রী ওপর ন্যস্ত ছিল। রাষ্ট্রপতি নামমাত্র প্রধান।

৬. এক কক্ষবিশিষ্ট আইন পরিষদ : ৭২-এর সংবিধানে এক কক্ষবিশিষ্ট আইন পরিষদের ব্যবস্থা করা হয়। সংবিধানে বলা হয়, সরাসরি নির্বাচনের মাধ্যমে ৩০০ জন সদস্য ও সংরক্ষিত মহিলা আসনে ১৫ জন সদস্য নিয়ে আইন পরিষদ গঠিত হবে। আইন পরিষদকে 'জাতীয় সংসদ' বলে অভিহিত হবে।

৭. দুষ্পরিবর্তনীয় : এই সংবিধান সংশোধনের এক বিশেষ পদ্ধতি অবলম্বন করা হয় যা সাধারণ আইন প্রণয়ন পদ্ধতির মতো সহজ নয়। সংবিধান সংশোধনের ক্ষেত্রে জাতীয় সংসদের মোট সদস্যসংখ্যার দুই-তৃতীয়াংশ সদস্যের ভোট প্রয়োজন হবে। সংবিধান সংশোধনী বিল রাষ্ট্রপতির সম্মতির জন্য পেশ করা হবে। ৭ দিনের মধ্যে রাষ্ট্রপতি বিলে সম্মতি দেবেন। ৭ দিন অতিক্রান্তহলে সম্মতি দিয়েছেন বলে ধরে নেয়া হবে।

৮. **স্বাধীন বিচার বিভাগ :** সংবিধানে একটি স্বাধীন নিরপেক্ষ বিচার বিভাগ প্রতিষ্ঠার উল্লেখ আছে। নির্বাহী বিভাগ থেকে বিচার বিভাগকে পৃথকের মাধ্যমে বিচার বিভাগের স্বাধীনতা নিশ্চিত করবে রাষ্ট্র। সংবিধানের বিধানাবলি অনুযায়ী প্রধান বিচারপতি স্বাধীনভাবে বিচারকার্য পরিচালনা করবেন।

৯. **সাম্প্রদায়িক রাজনীতি নিষিদ্ধ :** সংবিধানের মূলনীতির সঙ্গে মিল রেখে ধর্মভিত্তিক রাজনীতি নিষিদ্ধ করা হয়। ধর্মের নামে কেউ যাতে বিভেদ তৈরি করতে না পারে।

বঙ্গবন্ধু সরকারের জন্য সবচেয়ে গুরুত্বপূর্ণ সাফল্য হলো স্বল্পতম সময়ের মধ্যে বাংলাদেশের জন্য একটি সংবিধান প্রণয়ন করা। সংবিধানের বিধানাবলির মধ্য দিয়ে সদ্য স্বাধীন দেশের জনগণের আশা-আকাঙ্ক্ষার প্রতিফলন ঘটেছে।

সার-সংক্ষেপ

সংবিধান রাষ্ট্রপরিচালনার প্রধান আইন। স্বাধীনতা লাভের এক বছরের মধ্যেই বাংলাদেশের সংবিধান প্রণীত হয়। দেশ সুষ্ঠুভাবে পরিচালনার জন্য একটি সংবিধানের প্রয়োজন ছিল। বাংলাদেশের সংবিধান নানা কারণে বৈশিষ্ট্যপূর্ণ। গণপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশ সংবিধানে জনগণের মৌলিক অধিকার সন্নিবেশিত হয়েছে। যা বাংলাদেশের সংবিধানকে অন্যদেশের সংবিধান থেকে ভিন্ন হিসেবে প্রতীয়মান করে।

পাঠোত্তর মূল্যায়ন ঃ ১১.১

নৈর্ব্যত্তিক প্রশ্ন

১. বাংলাদেশ অস্থায়ী সংবিধান আদেশ জারি করা হয়-
   ক) ১১ ফেব্রুয়ারি ১৯৭২ খ) ১০ জানুয়ারি ১৯৭২
   গ) ১১ জানুয়ারি ১৯৭৩ ঘ) ১১ জানুয়ারি ১৭৯২

২. সংবিধান প্রণয়ন কমিটির সভাপতি ছিলেন–
   ক) ব্যারিস্টার জমির উদ্দিন সরকার খ) ড. কামাল হোসেন
   গ) ড. জহির ঘ) আব্দুস সামাদ আজাদ

৩. গণপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশের সংবিধান গণপরিষদ কর্তৃক পাশ হয়–
   ক) ১৬ ডিসেম্বর খ) ৪ নভেম্বর ১৯৭২
   গ) ৮ নভেম্বর ১৯৭২ ঘ) ৪ নভেম্বর ১৯৭৩

৪. ১৯৭২ সালের সংবিধানে রাষ্ট্রীয় মূলনীতি বর্ণিত আছে–
   ক) ৮টি খ) ৫টি
   গ) ৪টি ঘ) ৩টি

সংক্ষিপ্ত উত্তর প্রশ্ন

১. সংবিধান কী?

২. বাংলাদেশের প্রথম গণপরিষদ কখন গঠিত হয়। এর সদস্য কারা ছিলেন?

৩. ১৯৭২ সালের সংবিধানের দুইটি বৈশিষ্ট্যগুলি লিখুন।

৪. বঙ্গবন্ধু সরকারের অন্যতম সফলতা কোনটি বলে আপনি মনে করেন। লিখুন।

স্বাধীনতাত্তোর গুরুত্বপূর্ণ রাজনৈতিক বিকাশ (১৯৭২-১৯৭৫)

উদ্দেশ্য

এই পাঠ শেষে আপনি —

- ১৯৭৩ সালের সাধারণ নির্বাচন ও ফলাফল সম্পর্কে বিস্তারিত বর্ণনা দিতে পারবেন।
- ১৯৭৫ সালে "বাংলাদেশ কৃষক শ্রমিক লীগ" বাকশাল গঠনের পটভূমি ব্যাখ্যা করতে পারবেন।

সংসদীয় সরকার ব্যবস্থা প্রবর্তন

আওয়ামী লীগের নেতৃত্বে সরকার গঠন

১৯৭১ সালের ১৬ ডিসেম্বর পাকিস্তানি বাহিনীকে পরাজিত করে ঐতিহাসিক বিজয় লাভের পর পরই বঙ্গবন্ধুর নেতৃত্বে বাংলাদেশ আওয়ামী লীগ দেশের শাসনভার গ্রহণ করে। বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমান ১০ জানুয়ারি ১৯৭২ সালে দেশে প্রত্যাবর্তন করেন। ১১ জানুয়ারি তিনি অস্থায়ী সংবিধান আদেশ অনুযায়ী দেশে সংসদীয় সরকার ব্যবস্থা প্রবর্তন করেন। বঙ্গবন্ধুর দৃঢ় নেতৃত্বে মাত্র দু'মাসের মধ্যে বাংলাদেশ থেকে ভারতীয় সৈন্য প্রত্যাহার করা হয়। দেশের প্রতিটি জেলায় বেসাময়িক প্রশাসন সচল হয়। ১৯৭২ সালের ডিসেম্বর মাসে বাংলাদেশের সংবিধান প্রণীত হয়।

আওয়ামী লীগের নিরঙ্কুশ সংখ্যাগরিষ্ঠতা লাভ

বাংলাদেশের প্রথম সাধারণ নির্বাচন, ১৯৭৩

স্বাধীন বাংলাদেশে প্রথম সাধারণ নির্বাচন অনুষ্ঠিত হয় ১৯৭৩ সালের ৭ মার্চ। বাংলাদেশের সংবিধান কার্যকর হওয়ার পর গণপরিষদ ভেঙ্গে দেয়া হয়। স্বাধীনতা লাভের স্বল্প সময়ের মধ্যে বঙ্গবন্ধুর সরকার সাধারণ নির্বাচনের সিদ্ধান্তগ্রহণ করে গণতন্ত্রের পথে গুরুত্বপূর্ণ অবদান রাখে। নির্বাচনে আওয়ামী লীগ নিরঙ্কুশ বিজয় অর্জন করে। জাতীয় সংসদের সংরক্ষিত মহিলা আসনসহ ৩১৫টি আসনের মধ্যে আওয়ামী লীগ ৩০৬, জাতীয় সমাজতান্ত্রিক দল (জাসদ) ২টি, বাংলাদেশ জাতীয় লীগ ১টি এবং স্বতন্ত্র সদস্যরা ৬টি আসনে জয়লাভ করেন। বঙ্গবন্ধুর ব্যাপক জনপ্রিয়তা এবং মুক্তিযুদ্ধে নেতৃত্বদানকারী দল আওয়ামী লীগের পক্ষে নির্বাচনী ফলাফল যাবে এটাই ছিল স্বাভাবিক।

১৯৭৩ সালের সাধারণ নির্বাচন

সংবিধান রচনা এবং অনুমোদনের সাথে সাথে গণপরিষদের কার্যক্রমের সমাপ্তি ঘটে এবং ১৯৭৩ সালের ৭ই মার্চ বাংলাদেশে প্রথম সাধারণ নির্বাচন অনুষ্ঠিত হয়। এ নির্বাচনে আওয়ামী লীগ অন্যান্য চৌদ্দটি দলের সাথে প্রতিদ্বন্দ্বিতা করে। এই নির্বাচনে রাজনৈতিক দল সমূহের প্রার্থী ছিল ১,০৮৯ জন ও স্বতন্ত্র ১২০ জন অর্থাৎ মোট প্রার্থী ছিল ১,২০৯ জন। এবং ১৫ জন নারী প্রতিদ্বন্দ্বী ছিল।

বাংলাদেশে ১৯৭৩ সালের প্রথম জাতীয় সংসদ নির্বাচনের ফলাফল

রাজনৈতিক দল	প্রাপ্ত আসন	সংরক্ষিত মহিলা আসন	মোট
বাংলদেশ আওয়ামী লীগ	২৯৩	১৫	৩০৮
জাতীয় সমাজতান্ত্রিক দল (জাসদ)	১	-	১
বাংলাদেশ জাতীয় লীগ	১	-	১
স্বতন্ত্র	৫	-	৫
মোট	৩০০	১৫	৩১৫

আওয়ামী লীগের প্রার্থীগণ ৩০০ সংসদীয় আসনের ২৯৩টি আসনে বিজয়ী হওয়ার মধ্যদিয়ে দলটি জাতীয় সংসদে বিপুল সংখ্যাগরিষ্ঠতা লাভ করে। নির্বাচনে শতকরা ৫৫.৬১ ভাগ ভোটার ভোট প্রদান করে এবং বিজয়ী দল ওই ভোটের শতকরা ৭৩.২০ ভাগ লাভ করে। সংসদে নারীদের জন্য নির্ধারিত সংরক্ষিত আসনসহ দলটির আসন সংখ্যা হয় ৩০৮। প্রথম সংসদে ক্ষমতাসীনদের ব্যাপক প্রাধান্য এবং বিরোধী দলের খুবই কম আসনপ্রাপ্তির ফলে সংসদে 'বিরোধী দল' বলে মূলত কিছুই থাকে না। জাতীয় সংসদের ৩০০টি আসনের মধ্যে ১১টি আসনে আওয়ামী লীগ প্রার্থী ৭ মার্চ নির্বাচনের পূর্বেই বিনা প্রতিদ্বন্দ্বিতায় নির্বাচিত হয়েছিলেন। ৮ই মার্চ ১৯৭৩ সালে নির্বাচন পরবর্তী এক সাংবাদিক সম্মেলনে বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিব বলেন, 'বাংলাদেশে এখন কোনো বিরোধী দল নেই'। নির্বাচনের ফলে বিরোধী দল একরূপ শূন্যের কোঠায় পৌঁছেছিল। বঙ্গবন্ধুর নেতৃত্বে ১৯৭৩-এর ১৬ মার্চ নতুন মন্ত্রিসভা গঠিত হয়। এই সংসদে শক্তিশালী বিরোধীদলের অনুপস্থিতি শুরুতেই বাংলাদেশে সংসদীয় রাজনীতির ধারা ক্ষতিগ্রস্ত হয়। ১৯৭৪ সালে দেশের অভ্যন্তরে সৃষ্ট দুর্ভিক্ষ, রাজনৈতিক অস্থিরতা, নব সৃষ্ট চরমপন্থী দলগুলির তৎপরতা, আন্তর্জাতিক চক্রান্ত এবং দুর্নীতির কারণে সদ্য স্বাধীন হওয়া দেশে এক সংকটের সৃষ্টি হয়।

সরকারের কতিপয় কৃতিত্বপূর্ণ পদক্ষেপ

বঙ্গবন্ধুর নেতৃত্বে সরকার বেশ কিছু ইতিবাচক পদক্ষেপ নেয়। যেমন ঃ বেসামরিক মুক্তিযোদ্ধাদের নিরস্ত্রীকরণ, শরণার্থীদের পুর্নবাসন, অবকাঠামোগত পুর্ণগঠন, পরিত্যাক্ত শিল্প কারখানা পরিচালনা, স্বীকৃতি ও সাহায্যের জন্য আন্তর্জাতিক সম্প্রদায়ের সাথে আলোচনা প্রভৃতি।

সংসদীয় পদ্ধতির সরকারব্যবস্থা

মুক্তিযুদ্ধের সূচনালগ্নে গঠিত বাংলাদেশ সরকারের রাষ্ট্রপতি ছিলেন বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমান। কিন্তু বাংলাদেশের সরকারব্যবস্থার ধরণ কী হবে, এই সম্পর্কে কোনো সিদ্ধান্তপূর্বে গ্রহণ করা হয়নি। ১৯৭২ সালের ১১ জানুয়ারি বঙ্গবন্ধু মন্ত্রিসভায় দীর্ঘ আলোচনার পর 'অস্থায়ী সংবিধান আদেশ' জারির মাধ্যমে দেশের সংসদীয় পদ্ধতির সরকারব্যবস্থা প্রবর্তন করেন। ১২ জানুয়ারি বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমান প্রধান বিচারপতি আবু সাদাত মোহাম্মদ সায়েমের নিকট রাষ্ট্রপতি হিসেবে শপথ গ্রহণ করেন। একই দিনে রাষ্ট্রপতি হিসেবে নিয়োগ লাভ করেন বিচারপতি আবু সাঈদ চৌধুরী।

এই ব্যবস্থা সংসদীয় গণতন্ত্রের প্রতি বঙ্গবন্ধুর গভীর আস্থার পরিচয় বহন করে। ১৯৭২ সালের ১২ জানুয়ারি থেকে ১৯৭৫ সালের ১৫ আগস্ট বঙ্গবন্ধুর নেতৃত্বে বাংলাদেশ সরকার পরিচালিত

হয়। এই সরকার মাত্র তিন বছর সাত মাস তিন দিন দায়িত্ব পালনের সুযোগ পায়। এই স্বল্পতম সময়ে তিনি পাকিস্তানি বাহিনীর ধ্বংসযজ্ঞ থেকে দেশকে গড়ে তোলা এবং আন্তর্জাতিক স্বীকৃতি আদায়ের মাধ্যমে বহির্বিশ্বে সম্মানজনক ভাবমূর্তি নির্মাণে অনন্য সাধারণ অবদান রাখেন।

যুদ্ধ বিধ্বস্ত দেশ পুনর্গঠন

স্বাধীনতা-পরবর্তী বাংলাদেশের অবস্থা ছিল ভয়াবহ। একেবারেই শূন্য হতে যাত্রা শুরুকরে বঙ্গবন্ধু সরকার। প্রশাসন, ভৌত অবকাঠামো সবকিছুই ছিল বিপর্যস্ত। সামগ্রিকভাবে পরিস্থিতি ছিল অভ্যন্তহতাশাজনক। বাংলাদেশ স্বাধীন রাষ্ট্র হিসেবে টিকিয়ে রাখতে পারবে কী না? সে বিষয়ে সংশয় দেখা দেয়।

নয় মাসের মুক্তিযুদ্ধে পাকিস্তান সেনাবাহিনী ও তাদের এদেশীয় দোসর রাজাকার, আলবদর, আলশামস গণহত্যা, নারী নির্যাতনের পাশাপাশি সম্পদ বিনষ্টের এক ধ্বংসলীলায় মেতে উঠেছিল। সারা দেশের প্রায় ৪৩ লক্ষ বসতবাড়ি, ৩ হাজার অফিস ভবন, ১৮ হাজার প্রাথমিক বিদ্যালয়, ৬ হাজার হাইস্কুল ও মাদ্রাসা, ৯ শত কলেজ ভবন ও ১৯ হাজার গ্রামীণ হাট-বাজার জ্বালিয়ে দেয়। পরিকল্পিতভাবে পাকিস্তানিবাহিনী যোগাযোগ ব্যবস্থাও ধ্বংস করে দেয়। ২৭৪টি ছোট-বড় সড়ক সেতু ও ৩০০টি রেল সেতু ধ্বংসপ্রাপ্ত হয়। রেলওয়ে ইঞ্জিন, বগি ও রেল লাইনেরও ব্যাপক ক্ষতিসাধন করে। মাইন পুঁতে রাখার কারণে নৌবন্দরগুলো ব্যবহার করা সম্ভব হয়নি। চূড়ান্তপরাজয়ের পূর্বে পাকিস্তান সেনাবাহিনী ব্যাংকসমূহে রক্ষিত কাগজের নোটগুলো জ্বালিয়ে দেয়। গচ্ছিত স্বর্ণ লুট করে নিয়ে যায়। ফলে ব্যাংকগুলো তহবিলশূন্য হয়ে পড়ে।

পুনর্বাসন ও পুনর্গঠনের কঠিন দায়িত্ব নিয়ে কাজ শুরুকরে সরকার। প্রশাসনিক কাঠামো ভেঙে পড়ায় রেডক্রস সোসাইটি এবং ত্রাণ ও পুনর্বাসন কমিটির মাধ্যমে জেলা থেকে গ্রাম পর্যায় পর্যন্তত্রাণসামগ্রী বিতরণ করা হয়। ১৯৭২ সালের শুরুতে পুনর্বাসন কার্যক্রমের জন্য সরকারি হিসেবে মাসিকভিত্তিক এক চাহিদাপত্র তৈরি করা হয়। এতে প্রতি মাসে খাদ্যের প্রয়োজন ছিল দুই লক্ষ থেকে আড়াই লক্ষ টন এবং ওষুধসহ অন্যান্য নিত্যপ্রয়োজনীয় অন্যান্য দ্রব্য সামগ্রীর চাহিদা ছিল দুই লক্ষ টন। বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিব সরকার প্রধান হিসেবে ১৪ জানুয়ারি, ১৯৭২ প্রথম সংবাদ সম্মেলনে সরকারের জরুরি কর্মপরিকল্পনা উপস্থাপনের পাশাপাশি বিশ্বের সকল রাষ্ট্র, স্বাধীনতাপ্রিয় মানুষ ও আন্তর্জাতিক প্রতিষ্ঠানসমূহকে উদার সাহায্য প্রদানের আহ্বান জানান।

উন্নয়ন, পুনর্গঠন ও পুনর্বাসন কার্যক্রম

কৃষির উন্নয়ন

স্বাধীনতার পর পর বাংলাদেশের শতকরা ৮৫ ভাগ জনগণের জীবিকা ছিল কৃষির ওপর নির্ভরশীল। জাতীয় আয়ের অর্ধেকেরও বেশি আসত কৃষিখাত থেকে। তাই বঙ্গবন্ধু কৃষিব্যবস্থার উন্নয়নে বিশেষ মনোযোগ দিয়েছিলেন। যেমন–

ক) ২৫ বিঘা পর্যন্তজমির খাজনা মওকুফসহ পূর্বের সমস্ত বকেয়া খাজনা মওকুফ করে দেন।

খ) একটি পরিবার সর্বাধিক ১০০ বিঘা পর্যন্তজমির মালিকানা নির্ধারণ করেন।

গ) বাইশ লাখের অধিক কৃষক পরিবার পুনর্বাসন করা হয়।

সম্পদের সীমাবদ্ধতা সত্ত্বেও বঙ্গবন্ধু মানবসম্পদের উন্নয়নে শিক্ষার ওপর গুরুত্বারোপ করেন। সরকারের দায়িত্ব গ্রহণের মাত্র ছয় মাসের মধ্যে তিনি স্বাধীন দেশের উপযোগী শিক্ষাব্যবস্থা

গড়ে তোলার কার্যকর উদ্যোগ গ্রহণ করেন। এই লক্ষ্যে বিশিষ্ট বিজ্ঞানী ড. মুহাম্মদ কুদরত-ই-খুদার নেতৃত্বে ১৯৭২ সালের ২৬ জুলাই শিক্ষা কমিশন গঠন করেন।

শিক্ষার উন্নয়ন

শিক্ষা ক্ষেত্রে বঙ্গবন্ধু জরুরি ভিত্তিতে কিছু পদক্ষেপ গ্রহণ করেন। তিনি ৯০০ কলেজ ভবন ও ৪০০ হাইস্কুল পুননির্মাণ করেন। প্রথমবারের মতো সকল প্রাথমিক বিদ্যালয়কে সরকারিকরণ করেন। মুক্তিযুদ্ধের সময় শিক্ষকদের পাওনা ৯ মাসের বকেয়া বেতন পরিশোধ করেন। সরকারি বিশ্ববিদ্যালয়সমূহে স্বায়ত্তশাসন প্রদানের জন্য জাতীয় সংসদে ১৯৭৩ সালের বিশ্ববিদ্যালয় আইন পাস করেন।

সড়ক, রেল ও বিমান যোগাযোগের উন্নয়ন

মুক্তিযুদ্ধের সময় ধ্বংসপ্রাপ্ত সকল ব্রিজ-সেতু জরুরি ভিত্তিতে পুনর্নির্মাণ শুরুহয়। ১৯৭৪ সালের মধ্যে দেশের যোগাযোগব্যবস্থা একটা সন্তোষজনক অবস্থায় উন্নীত হয়। ঢাকা-আরিচা সড়কের বড় বড় সড়ক সেতুগুলোসহ ৯৭টি নতুন সড়ক সেতু নির্মাণ করা হয়। হার্ডিঞ্জ ব্রিজসহ ধ্বংসপ্রাপ্ত অন্যান্য রেল সেতুগুলোও চালু হয়। যমুনা নদীর ওপর সেতু নির্মাণের পরিকল্পনা গ্রহণ করা হয়। ১৯৭৪ সালের ৪ নভেম্বর যমুনা সেতুর প্রাথমিক সম্ভাব্যতা প্রতিবেদন প্রস্তুত করা হয়। বিমান যোগাযোগের ক্ষেত্রেও যথেষ্ট গুরুত্ব দেওয়া হয়। অভ্যন্তরীণ ও আন্তর্জাতিক-উভয় রুটে বিমান চালু, তেজগাঁও বিমানবন্দর ব্যবহার উপযোগী করার কাজ দ্রুত সম্পন্ন হয়। ১৯৭২ সালের ৭ মার্চের মধ্যে ঢাকার সঙ্গে চট্টগ্রাম, সিলেট, যশোর ও কুমিল্লার বিমান যোগাযোগ কার্যকর হয়। ঢাকা-লন্ডন রুটে ১৯৭৩ সালের ১৮ জুন প্রথম ফ্লাইট চালু হয়।

প্রথম পাঁচসালা পরিকল্পনা

নবীন রাষ্ট্র হিসেবে দীর্ঘমেয়াদি উন্নয়ন পরিকল্পনা প্রণয়নের জন্য ১৯৭২ সালের জানুয়ারি মাসে সরকার পরিকল্পনা কমিশন গঠন করে। যুদ্ধবিধ্বস্ত দেশ পুর্নগঠন, দারিদ্র্য হ্রাস, প্রবৃদ্ধির হার ৩% থেকে ৫.৫%-এ উন্নীত করার জন্য ব্যবস্থা গ্রহণ করা হয়। খাদ্য উৎপাদনে স্বয়ংসম্পূর্ণতা অর্জন এবং ক্রমান্বয়ে বৈদেশিক সাহায্যের ওপর নির্ভরশীলতা হ্রাস করার উদ্যোগ গ্রহণ করা হয়। এ ছাড়া সামগ্রিক অর্থনৈতিক উন্নয়নের লক্ষ্য নিয়ে প্রথম পাঁচমালা পরিকল্পনা (১৯৭৩-১৯৭৮) ১৯৭৩ সালের ১ জুলাই থেকে কার্যকর হয়।

বৈদেশিক সম্পর্ক

সদ্য স্বাধীন একটি রাষ্ট্র হিসেবে বাংলাদেশের অস্তিত্ব ও উন্নয়ন নিশ্চিত করতে পররাষ্ট্রনীতির ভূমিকা ছিল অত্যন্তগুরুত্বপূর্ণ। বঙ্গবন্ধুর ১০ জানুয়ারি ১৯৭২ দেশে ফিরে আসার পূর্বে ভারত ও ভূটান ছাড়া আর কোনো রাষ্ট্রের স্বীকৃতি পায়নি বাংলাদেশ। পাকিস্তান ও তার মিত্রদের বাংলাদেশ বিরোধী প্রচারণায় বিশ্বের অধিকাংশ রাষ্ট্র তখনও বিভ্রান্ত। অন্যদিকে যুদ্ধবিধ্বস্ত দেশ পুনর্গঠনে আন্তর্জাতিক সম্প্রদায়ের সাহায্য-সহযোগিতা লাভ জরুরি হয়ে পড়ে। বঙ্গবন্ধু তাঁর দীর্ঘ রাজনৈতিক অভিজ্ঞতা ও মেধা দিয়ে উপলব্ধি করেছেন যে বাংলাদেশের পররাষ্ট্রনীতিতে দুটি বিষয়কে গুরুত্ব দিতে হবে।

প্রথমত: স্বীকৃতি আদায়ের মধ্যমে আন্তর্জাতিক পরিমন্ডলে বাংলাদেশের গ্রহণযোগ্যতা বৃদ্ধি করা।

দ্বিতীয়ত: দেশ পুনর্গঠনে বিদেশি সহায্য-সহযোগিতা নিশ্চিত করা।

দেশের পররাষ্ট্রনীতিতে বঙ্গবন্ধু নীতিনির্ধারকের ভূমিকা পালন করেন। তিনি সব সময় স্বাধীন ও জোটনিরপেক্ষ পররাষ্ট্রনীতির কথা বলেছেন। তিনি পররাষ্ট্রনীতির দিক-নির্দেশনা দিতে গিয়ে বলেন, 'আমরা বাংলাদেশকে দক্ষিণ এশিয়ার সুইজ্যারল্যান্ড হিসেবে গড়ে তুলতে চাই।' ১৯৭২ সালের সংবিধানে পররাষ্ট্রনীতির রূপরেখায় বঙ্গবন্ধুর চিন্তা-ভাবনার প্রতিফলন লক্ষ করা যায়। পররাষ্ট্রনীতির মূল কথা হলো, শান্তিপূর্ণ সহাবস্থান এবং সবার সঙ্গে বন্ধুত্ব, কারও সঙ্গে শত্রুতা নয়। সাম্রাজ্যবাদ, উপনিবেশবাদ ও বর্ণবাদের বিরুদ্ধে বিশ্বের নিপীড়িত জনগণের পক্ষে থাকবে বাংলাদেশ।

বাংলাদেশের জন্য স্বীকৃতি আদায়ের কাজটি খুব একটা সহজসাধ্য ছিল না। কারণ, পাকিস্তানের বৈরী প্রচারণায় মুসলিম বিশ্বসহ চীন বাংলাদেশ সম্পর্কে নেতিবাচক মনোভাব পোষণ করত। বঙ্গবন্ধুর সফল নেতৃত্বে ১৯৭৪ সালের মধ্যেই বাংলাদেশ বিশ্বের অধিকাংশ রাষ্ট্র ও জাতিসংঘসহ প্রায় সকল আন্তর্জাতিক সংস্থার স্বীকৃতি লাভ করে। সাধারণ পরিষদের সর্বসম্মত সিদ্ধান্তঅনুযায়ী ১৭ সেপ্টেম্বর, ১৯৭৪ জাতিসংঘের ১৩৬তম সদস্য বাংলাদেশ যোগদান করে। বঙ্গবন্ধু ১৯৭৪ সালের ২৫ সেপ্টেম্বর জাতিসংঘের সাধারণ পরিষদের ২৯তম অধিবেশনে প্রথমবারের মতো আমাদের মাতৃভাষা বাংলায় ভাষণ দেন। ফলে আন্তর্জাতিক পর্যায়ে বাংলা ভাষা লাভ করে নতুন মর্যাদা।

বঙ্গবন্ধু সরকার বিশ্বের সকল রাষ্ট্রের সঙ্গে সম্পর্কের ক্ষেত্রে বাংলাদেশের জাতীয় স্বার্থকে সবার উপরে স্থান দিয়েছেন। মুক্তিযুদ্ধে নানাভাবে সাহায্য সহযোগিতা করায় ভারত, সোভিয়েত ইউনিয়নসহ অন্যান্য সমাজতান্ত্রিক দেশগুলোর সঙ্গে বাংলাদেশের আন্তরিক বন্ধুত্বপূর্ণ সম্পর্ক গড়ে ওঠে।

বাংলাদেশের ঐ সময় যে পরিমাণ অর্থনৈতিক সাহায্যের প্রয়োজন ছিল তার জন্য সোভিয়েত ইউনিয়নসহ পূর্ব ইউরোপের দেশগুলোর ওপর নির্ভর করতে হয়েছে। সমাজতান্ত্রিক দেশগুলো তাদের সীমিত সম্পদের কারণে বাংলাদেশের পাশে দাঁড়াতে পারেনি। পরবর্তী সময়ে বাংলাদেশকে অর্থনৈতিক সাহায্যের জন্য পুঁজিবাদী ও মুসলিম দেশগুলোর ওপর অধিক নির্ভর করতে হয়েছে। মুক্তিযুদ্ধের বিরোধিতা করায় বঙ্গবন্ধু সরকার প্রথম দিকে মার্কিন সাহায্য গ্রহণে অস্বীকৃতি জানায়। তবে বঙ্গবন্ধু সরকার দেশের স্বার্থে পুঁজিবাদী ও মুসলিম বিশ্বের দেশগুলোর সঙ্গে সুসম্পর্ক স্থাপনে কার্যকর উদ্যোগ গ্রহণ করেছিলেন। তারপরও বঙ্গবন্ধুর শাসনামলে বাংলাদেশ বিশ্বের ১৩০টি রাষ্ট্রের স্বীকৃতি অর্জন করে। এ ছাড়া জাতিসংঘ, কমনওয়েলথ ও ইসলামি সম্মেলন সংস্থার সদস্যপদসহ ১৪টি আন্তর্জাতিক সংগঠনের সদস্যপদ লাভ করে।

রাষ্ট্রপতি শাসিত সরকার পদ্ধতির প্রবর্তন

১৯৭৫-এর ২৫ জানুয়ারি দেশে রাষ্ট্রপতি শাসিত সরকার পদ্ধতির প্রবর্তন করা হয়। রাষ্ট্রপতি সকল ক্ষমতার অধিকারী হয়ে পড়েন। এই ব্যবস্থায় মন্ত্রিপরিষদ ও জাতীয় সংসদের কোনো ক্ষমতা ছিল না। সংবিধানের চতুর্থ সংশোধনীর মাধ্যমে সরকার পদ্ধতির পরিবর্তন আনা হয়। এই সংশোধনী অনুযায়ী রাষ্ট্রপতি জনগণের প্রত্যক্ষ ভোটে ৫ বছরের জন্য নির্বাচিত হবেন। তিনি ইচ্ছানুযায়ী উপরাষ্ট্রপতি, প্রধানমন্ত্রী, মন্ত্রী এবং অন্যান্য সরকারি বিভাগের কর্মকর্তা নিয়োগ ও বরখাস্ত করতে পারবেন। ১৯৭৫-এর ২৪ ফেব্রুয়ারি রাষ্ট্রপতি বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমান অন্যান্য রাজনৈতিক দল ভেঙ্গে দিয়ে 'বাংলাদেশ কৃষক শ্রমিক আওয়ামী লীগ' (বাকশাল) নামে একটি জাতীয় রাজনৈতিক দল গঠন করেন। এই দলের চেয়ারম্যান হলেন বঙ্গবন্ধু এবং সাধারণ সম্পাদক হলেন এম. মনসুর আলী।

চতুর্থ সংশোধনীর মাধ্যমে সরকারব্যবস্থার পরিবর্তন নানা বিতর্কের জন্ম দেয়। এই ব্যবস্থার বিপক্ষে বলা হয়, এর ফলে জাতীয় সংসদের ক্ষমতা খর্ব হয়, রাষ্ট্রপতিকে অসীম ক্ষমতা প্রদান করা হয় এবং একক রাজনৈতিক দল গঠন করে সম্পূর্ণ অগণতান্ত্রিক ব্যবস্থা প্রবর্তন করা হয়। বঙ্গবন্ধু নতুন সরকার পদ্ধতির সীমাবদ্ধতার বিষয়ে সম্পূর্ণ সচেতন ছিলেন। তিনি সাময়িকভাবে এই ব্যবস্থা গ্রহণ করেছিলেন। দেশের আর্থ-সামাজিক ও আইনশৃঙ্খলার জরুরি পরিস্থিতি মোকাবেলায় সংবিধানের চতুর্থ সংশোধনী অনিবার্য হয়ে পড়ে। আন্তর্জাতিক রাজনৈতিক পরিস্থিতিও চতুর্থ সংশোধনী গ্রহণে অনুপ্রাণিত করেছিল। উল্লেখ্য, বিশ্বের সমাজতান্ত্রিক দেশগুলোতে একক রাজনৈতিক দল ব্যবস্থার নজির রয়েছে।

রাষ্ট্রপতি শাসন প্রবর্তন এবং বাকশাল গঠন

বাংলাদেশ কৃষক শ্রমিক আওয়ামী লীগ (বাকশাল) গঠন

১৯৭৪ সালের সৃষ্ট দুর্ভিক্ষের পাশাপাশি রাজনৈতিক অস্থিরতা ও হিংসাত্মক কার্যকলাপ ব্যাপক আকার ধারণ করে। তৎকালীন বিরোধীদল জাসদ 'অবিরাম বিপ্লব' কর্মসূচি গ্রহণ করে এবং সরকারের বিরুদ্ধে সরাসরি সশস্ত্র সংগ্রামে লিপ্ত হয়। ১৯৭৪ সালের জুন মাসে জাসদ "বিপ্লবী গণবাহিনী" নামে একটি সশস্ত্র অঙ্গসংগঠন ও সশস্ত্র বাহিনীর মধ্যে "বিপ্লবী সৈনিক সংস্থা" নামে একটি সেল গঠন করে। এসকল কারণে ক্ষমতাসীন ও বিরোধীদল সমূহের মধ্যে শান্তিপূর্ণ সহ অবস্থান বিঘ্নিত হয়। এই পরিস্থিতি থেকে উত্তরণের লক্ষ্যে সরকার রক্ষী বাহিনী নামে একটি আধাসামরিক বাহিনী গঠন করে। ১৯৭৪ সালে সরকার দেশব্যাপী জরুরি অবস্থা ঘোষণা করে এবং ১৯৭৫ সালে ২৫ জানুয়ারি সংবিধান সংশোধন করে (চতুর্থ সংশোধনী) মন্ত্রি পরিষদ বা সংসদীয় সরকারের পরিবর্তে রাষ্ট্রপতি শাসিত সরকার ব্যবস্থা প্রবর্তন করা হয়। ১৯৭৫ সালের ২৪ ফেব্রুয়ারি বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিব দেশে প্রচলিত সকল রাজনৈতিক দল বিলুপ্ত ঘোষণা করেন। বাংলাদেশ কৃষক শ্রমিক আওয়ামী লীগ (বাকশাল) নামে একটি জাতীয় দল গঠন করা হয়। বেসামরিক আমলা ও সেনা সদস্যদের এ দলে যোগদানের অনুমতি দেয়া হয়। এর কেন্দ্রীয় কমিটিতে রাজনীতিবিদ, শিক্ষক, সৈনিক, আমলা বিভিন্ন পেশার প্রতিনিধিদের নেওয়া হয়। এরপর শুরু হয় বাকশালে যোগ দেওয়ার হিড়িক। বুদ্ধিজীবী, আমলা, সরকারি কর্মচারী, সাংবাদিক সবাই শেখ মুজিব বা তাঁর প্রতিনিধির কাছে বাকশালে যোগ দেওয়ার আবেদন করতে থাকেন। চতুর্থ সংশোধনীর পর দেশে চারটি সংবাদপত্র চালু রাখার সিদ্ধান্ত গ্রহণ করা হয়। অধিকাংশ সংসদ সদস্য বাকশালে যোগ দেন। রাষ্ট্রপতিসহ কেবিনেট সদস্যগণ ও মন্ত্রীবর্গ সকলেই বাকশালের সদস্যপদ গ্রহণ করেন। দেশের রাজনীতি, প্রশাসন, বিচার ব্যবস্থা, সংগঠন এবং মিডিয়ার ওপর রাষ্ট্রীয় নিয়ন্ত্রণ ও নির্বাহী কর্তৃত্ব আরোপ করা হয়। রাজনৈতিক এবং রাষ্ট্রিক কাঠামোর এ ধরনের পরিবর্তনের ফলে সর্বাত্মক রাষ্ট্রের এবং রাষ্ট্রযন্ত্রের উদ্ভব ঘটে। অর্থাৎ বাকশাল গঠনের মাধ্যমে একদলীয় শাসন ব্যবস্থা চালু হয়। এ সময় বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিব সরকার বিভিন্ন আর্থ-সামাজিক ও প্রশাসনিক সংস্কার কার্যক্রম চালু করেন। জেলা প্রশাসনকে ঢেলে সাজানো হয়। জেলা সমূহে রাজনৈতিক প্রশাসনিক গভর্ণর নিয়োগ করা হয়। মুদ্রা মানের সংস্কার, খাদ্য উৎপাদনে নতুন উদ্যোগে, রফতানি প্রসারে নতুন কৌশল গ্রহণ করা হয়। নতুন রাষ্ট্রিক কাঠামোর কার্যক্রম এবং ঘোষিত নীতিমালা বাস্তবায়নের মুহূর্তে ১৯৭৫ সালের ১৫ই আগস্ট দেশে সামরিক অভ্যুত্থান ঘটে এবং বঙ্গবন্ধু সপরিবারে নির্মম হত্যার শিকার হন।

বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমানের হত্যাকাণ্ড

আওয়ামী লীগ সরকার পরিবর্তন এবং সামরিক হস্তক্ষেপ

১৯৭৫ সালের ১৫ আগস্ট এক সামরিক অভ্যুত্থান সংঘটিত হয়। এই অভ্যুত্থানে রাষ্ট্রপতি বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমান নির্মমভাবে সপরিবারে নিহত হন। সামরিক হস্তক্ষেপে আওয়ামী লীগ সরকারের পতন ঘটে এবং অভ্যুত্থানকারী সেনাসদস্যের ছত্রছায়ায় খন্দকার মোশতাক আহমদ রাষ্ট্রপতির পদে আসীন হন। তিনি সমগ্রদেশে অনির্দিষ্টকালের জন্য সামরিক শাসন জারি করেন। এইভাবে বাংলাদেশে সাংবিধানিক ধারা ব্যহত হয়।

দেশি-বিদেশি অনেক শুভাকাঙ্ক্ষী বঙ্গবন্ধুকে সাবধান করেছিলেন। রাষ্ট্রপতির এমন অরক্ষিত বাড়িতে বসবাস মোটেই নিরাপদ নয়। ব্যক্তিগত নিরাপত্তা নিয়ে তিনি কখনো শঙ্কিত ছিলেন না। অবিচল আস্থায় বলতেন, 'আমাকে কোনো বাঙালি মারবে না।'

১৫ আগস্ট, সেদিন ভোরের আলো তখনও ভালোভাবে ফুটে ওঠেনি। ঘাতকের দল ট্যাংক, কামান, মেশিনগানসহ অত্যাধুনিক মারণাস্ত্র নিয়ে রাস্তায় নেমে আসে। টার্গেট বঙ্গবন্ধু, তাঁর পরিবার এবং আত্মীয়-পরিজনকে হত্যা করা। আনুমানিক সাড়ে ৫টার দিকে বঙ্গবন্ধুর বাসভবনে আক্রমণ শুরুহয়। মেজর মহিউদ্দিন, মেজর হুদা, মেজর পাশা, মেজর নূরের নেতৃত্বে ঘাতকরা বঙ্গবন্ধুর বাড়ি ঘেরাও করে ফেলে।

জোর করে খুনির দল বঙ্গবন্ধুর বাড়িতে প্রবেশ করল। তখন ভোরের আলো অনেকটা পরিষ্কার। গোলাগুলির শব্দে আতঙ্কিত ধানমন্ডির অধিবাসীরা। নীল নকশা অনুযায়ী খুনিচক্র ঝাঁপিয়ে পড়ল জাতির পিতার পরিবারের ওপর। চিৎকার, হট্টগোল আর গুলির শব্দে ঘুম ভাঙ্গে বঙ্গবন্ধু পরিবারের। একে একে হত্যা করে প্রতিটি সদস্যকে। শিশু রাসেলও রেহাই পায়নি। স্টেনগান থেকে বঙ্গবন্ধুর বুক লক্ষ্য করে গুলি করে ঘাতকের দল। তাঁর বুকে ১৮টি গুলির আঘাত পাওয়া যায়। হত্যা করা হয় বঙ্গবন্ধুর সহধর্মিণী বেগম ফজিলাতুন্নেসা মুজিব, পুত্র শেখ কামাল, শেখ জামাল, শিশুপুত্র শেখ রাসেল। পুত্রবধূ সুলতানা কামাল ও রোজী জামাল, সহোদর শেখ নাসের, কৃষকনেতা আবদুর রব সেরনিয়াবাত, যুবনেতা শেখ ফজলুল হক মনি ও তাঁর অন্তঃসত্ত্বা স্ত্রী আরজু মনি, বেবী সেরনিয়াবাত, সুকান্তবাবু, আরিফ, আব্দুল নঈম খান রিন্টুসহ পরিবারের ১৮ জন সদস্যকে। বঙ্গবন্ধুর দুই কন্যা শেখ হাসিনা ও শেখ রেহানা দেশের বাইরে থাকায় প্রাণে বেঁচে যান।

মাত্র সাড়ে তিন বছরের শাসনামলে বঙ্গবন্ধু স্বাধীন রাষ্ট্র হিসেবে বাংলাদেশের অগ্রযাত্রার ভিত্তি নির্মাণে কৃতিত্বের পরিচয় দেন। তারপরও বাংলাদেশের রূপকার, এদেশের সব মানুষের অতি প্রিয় নেতাকে এভাবে জীবন দিতে হলো।

বঙ্গবন্ধু হত্যার ষড়যন্ত্রে দেশি-বিদেশি চক্র এবং সামরিক ও রাজনৈতিক ব্যক্তিবর্গ জড়িত ছিলেন। খুনি চক্রের নেতৃত্বে ছিলেন খন্দকার মোশতাক আহমদ। বঙ্গবন্ধুর মর্মান্তিক হত্যাকাণ্ডের কারণে বিশ্বের চোখে আমরা কৃতঘ্ন জাতিতে পরিণত হয়েছি। ক্ষমতা দখলকারীরা বাংলাদেশের ইতিহাস থেকে বঙ্গবন্ধু ও তাঁর কীর্তি মুছে ফেলার চেষ্টা করে। তাদের চেষ্টা সফল হয়নি। কারণ বাংলাদেশ থেকে বঙ্গবন্ধুকে বিচ্ছিন্ন করে বাংলাদেশের ইতিহাস রচনা সম্ভব নয়। কবি অন্নদাশঙ্কর রায় ক'টি পঙ্‌তির মধ্য দিয়ে সে কথাই বলেছেন,

> 'যতকাল রবে পদ্মা যমুনা
> গৌরী মেঘনা বহমান,
> ততকাল রবে কীর্তি তোমার
> শেখ মুজিবুর রহমান'।

সার-সংক্ষেপ

একটি দীর্ঘ সংগ্রাম ও স্বাধীনতাযুদ্ধে জয় লাভের মধ্য দিয়ে স্বাধীন বাংলাদেশে বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবের নেতৃত্বে প্রথম সরকার গঠিত হয়। স্বাধীনতার সংগ্রাম ও নয়মাস ব্যাপী যুদ্ধে অংশগ্রহণকারী বিভিন্ন মতের ও দলের ভূমিকা ও চাওয়া পাওয়া ছিল ভিন্ন। তাই স্বাধীনতা উত্তর রাজনীতিতে এদের প্রভাব উল্লেখযোগ্য ভাবে বেড়ে যায়। কিন্তু সরকারের পক্ষে উদ্ভূত সকল সমস্যা ও জনগণের চাওয়া- পাওয়ার সমাধান সম্ভবপর হয়নি। এতদসঙ্গে দুর্ভিক্ষ, বন্যা, সন্ত্রাস ও দুর্নীতি আওয়ামী লীগ সরকারকে ব্যতিব্যস্ত করে তোলে। ১৯৭২ সালে সংবিধান রচনার মাধ্যমে সংসদীয় সরকার প্রবর্তন করেও সে প্রক্রিয়া অব্যাহত রাখা যায়নি। তিন বৎসরের মধ্যেই সরকার সংবিধান পরিবর্তন করে একদলীয় শাসন ব্যবস্থা কায়েম করে। ১৯৭৫ সালের ১৫ আগস্ট এক সামরিক অভ্যুত্থানে দেশের রাষ্ট্রপতি বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমান সপরিবারে নির্মমভাবে নিহত হন। ফলে বাংলাদেশের সাংবিধানিক ধারা ব্যহত হয়।

পাঠোত্তর মূল্যায়ন ঃ ১১.২

নৈর্ব্যক্তিক প্রশ্ন

১. স্বাধীন বাংলাদেশে প্রথম সাধারণ নির্বাচন অনুষ্ঠিত হয়–
   ক) ১৯৭২ সালের ১৭ মার্চ　　খ) ১৯৭৩ সালের ৭ মার্চ
   গ) ১৯৭১ সালের ৭ মার্চ　　ঘ) ১৯৭৩ সালের ১৯ মে

২. ১৯৭২ সালের সংবিধানে সংরক্ষিত মহিলা আসন সংখ্যা–
   ক) ৩০টি　　খ) ২০টি
   গ) ১৫টি　　ঘ) ৪০টি

৩. সংবিধানের চতুর্থ সংশোধনী আনয়ন করা হয়–
   ক) ১৯৭৪ সালের ১৫ আগস্ট　　খ) ১৯৭৪ সালের ২৫ জানুয়ারি
   গ) ১৯৭৫ সালের ২৫ জানুয়ারি　　ঘ) ১৯৭৫ সালের ১৫ আগস্ট

৪. সংবিধানে চতুর্থ সংশোধনীর মাধ্যমে প্রবর্তিত হয়–
   ক) সংসদীয় পদ্ধতি সরকার　　খ) সামরিক সরকার
   গ) সমাজতন্ত্র সরকার　　ঘ) রাষ্ট্রপতি শাসিত সরকার

সংক্ষিপ্ত উত্তর প্রশ্ন

১. ১৯৭৩ সালের জাতীয় সংসদ নির্বাচনে দলগত ফলাফল লিখুন।

২. ‘বাকশাল’ কী এবং কখন গঠিত হয়? লিখুন।

সামরিক শাসন ও জিয়াউর রহমানের শাসনকাল (১৯৭৫-১৯৮১ খ্রিঃ)

উদ্দেশ্য

এই পাঠ শেষে আপনি —

- জিয়াউর রহমানের ক্ষমতা গ্রহণের পটভূমি সম্পর্কে বর্ণনা দিতে পারবেন।
- সামরিক শাসকদের বৈশিষ্ট্য কী তা ব্যাখ্যা করতে পারবেন।
- জিয়া সরকারের বেসামরিকীকরণ প্রক্রিয়া এবং সামরিক শাসন প্রত্যাহার সম্পর্কে বর্ণনা দিতে পারবেন।

আপনারা পূর্ববর্তী অধ্যায়ে জেনেছেন, ১৯৭৫ সালের ১৫ আগস্ট বাংলাদেশের রাষ্ট্রপতি বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমান ক্ষমতাচ্যুত ও সপরিবারে নির্মমভাবে নিহত হন। ১৯৭৫ সালের ১৫ আগস্টের অভ্যুত্থান-পাল্টা অভ্যুত্থান বাংলাদেশ সেনাবাহিনীতে ব্যাপকভাবে সন্দেহ-অবিশ্বাস, বা আস্থাহীনতার জন্ম দেয়। ১৯৭৫ সালের ১৫ আগস্ট বাংলাদেশের তৎকালীন রাষ্ট্রপতি বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমান সামরিক বাহিনীর হাতে সপরিবারে শহীদ হওয়ার পর খন্দকার মোশতাক আহমেদ রাষ্ট্রপতি পদে অধিষ্ঠিত হন। এরপর পাল্টাপাল্টি বেশ কয়েকটা সামরিক অভ্যুত্থান সংঘটিত হয়। ১৯৭৫ সালের ১৫ আগস্ট, ৩ নভেম্বর ও ৭ নভেম্বর প্রায় তিন মাসের মধ্যে তিনটি সামরিক অভ্যুত্থানে চেইন অব কমান্ড ভেঙ্গে পড়ে। সর্বশেষ অভ্যুত্থানে সেনাবাহিনীর ভেতরে রক্তপাত হয় বেশি, বিশেষভাবে অফিসারদের মধ্যে আতঙ্ক ছড়িয়ে পড়ে। ১৯৭৫ সালের ৭ নভেম্বর তৎকালীন সেনাবাহিনী প্রধান মেজর জেনারেল জিয়াউর রহমান এক অভ্যুত্থানের মাধ্যমে ক্ষমতা গ্রহণ করেন। রাষ্ট্রপতি বিচারপতি এ. এস. এম. সায়েম প্রধান সামরিক আইন প্রশাসক এবং তিন বাহিনীর প্রধানগণ 'উপপ্রধান' সামরিক আইন প্রশাসক হিসেবে দায়িত্ব গ্রহণ করেন।

জিয়াউর রহমানের ক্ষমতা গ্রহণের পটভূমি

খন্দকার মোশতাক ক্ষমতাচ্যুত

শেখ মুজিবুর হত্যাকাণ্ডের পর অভ্যুত্থানকারীদের সহয়তায় খন্দকার মোশতাক আহমদ রাষ্ট্রপতি ও প্রধান সামরিক আইন প্রশাসক পদে আসীন হন। তিনি ২৪ আগস্ট মেজর জেনারেল জিয়াউর রহমানকে বাংলাদেশ সেনাবাহিনীর চীফ অব স্টাফ পদে নিয়োগ দেন। বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিব সরকারের বেশ কয়েকজন মন্ত্রী মোশতাকের সরকারে যোগ দেন। ৩১ আগস্ট রাষ্ট্রপতি এক ঘোষণা বলে দেশে রাজনৈতিক দল ও রাজনৈতিক কার্যকলাপ সম্পূর্ণ নিষিদ্ধ ঘোষণা করেন। কিন্তু খন্দকার মোশতাক সামরিক আইন জারি করেও সেনাবাহিনীর মধ্যে নিয়ম শৃংখলা ফিরিয়ে আনতে ব্যর্থ হন। এর প্রতিক্রিয়া স্বরূপে ১৯৭৫ সালের ৩ নভেম্বর বাংলাদেশ সেনাবাহিনীর উপপ্রধান ব্রিগেডিয়ার খালেদ মোশাররফের নেতৃত্বে পাল্টা সামরিক অভ্যুত্থান ঘটে এবং রাষ্ট্রপতি মোশতাক ক্ষমতাচ্যুত হন। সুপ্রীম কোর্টের প্রধান বিচারপতি আবু সাদত মোঃ সায়েম রাষ্ট্রপতির দায়িত্ব গ্রহণ করেন। একই সঙ্গে খালেদ মোশাররফ মেজর জেনারেল পদে উন্নীত হয়ে সেনাবাহিনীর প্রধান হিসেবে নিয়োগ পান। জিয়াউর রহমানকে সেনা প্রধানের পদ থেকে অপসারণ ও গৃহবন্দী করা হয়। কিন্তু খালেদ মোশাররফের অভ্যুত্থান খুবই ক্ষণস্থায়ী হয়। তিন দিন ধরে রাষ্ট্র পরিচালনায় অনিশ্চয়তা বিরাজ করে। ঢাকা কেন্দ্রীয় কারাগারে বন্দি আওয়ামী লীগের চার শীর্ষ নেতা সৈয়দ নজরুল ইসলাম, তাজউদ্দিন আহমদ, এম. মনসুর আলী ও এ.এইচ.এম কামরুজ্জামানকে হত্যা করা হয়। এরূপ পরিস্থিতিতে ৭ নভেম্বর আরেক

সেনা অভ্যুত্থানে খালেদ মোশাররফ ও তার সহযোগীগণ নিহত হন। মেজর জেনারেল জিয়াউর রহমান মুক্ত ও পুনরায় সেনা বাহিনীর প্রধান নিযুক্ত হন। ১৯৭৬ সালে ২৮ নভেম্বর মেজর জেনারেল জিয়া রাষ্ট্রপতি সায়েম কর্তৃক প্রধান সামরিক আইন প্রশাসক নিযুক্ত হয়ে দেশের সকল ক্ষমতা গ্রহণ করে রাজনীতিতে আবির্ভূত হন। ১৯৭৭ সালে ২১ এপ্রিল সামরিক আইন অধ্যাদেশের মাধ্যমে জিয়াউর রহমান সংবিধান সংশোধন করেন। এ সময় আবু সাদত মোঃ সায়েম রাষ্ট্রপতির পদ ত্যাগ করলে জিয়াউর রহমান একই সঙ্গে বাংলাদেশের রাষ্ট্রপতি এবং প্রধান সামরিক আইন প্রশাসকের দায়িত্ব গ্রহণ করেন। সংসদ বাতিল করা হয়। জিয়া ক্ষমতা সংহতকরণে নানা পদক্ষেপ গ্রহণ করেন। জিয়াউর রহমান একজন উচ্চভিলাষী সামরিক কর্মকর্তা ছিলেন। একজন মুক্তিযোদ্ধা হিসেবে সেনাবাহিনীতে তাঁর জনপ্রিয়তা ছিল। স্বাধীনতার পর বঙ্গবন্ধু সরকার তাঁকে স্বল্প সময়ে অনেকগুলো পদোন্নতি দিয়ে মেজর জেনারেল পদে উন্নীত করেন। তাঁকে ১৯৭২ সালের জুন মাসে সেনাবাহিনীর ডেপুটি চিফ অব স্টাফ নিয়োগ দেওয়া হয়। মুক্তিযুদ্ধে অবদানের স্বীকৃতি স্বরূপ বঙ্গবন্ধু তাঁকে 'বীর উত্তম' উপাধি প্রদান করেন। মাত্র ৪০ বছর বয়সে রাষ্ট্রক্ষমতায় আসীন হয়ে জিয়া দ্রুততম সময়ের মধ্যে তাঁর ক্ষমতাকে স্থায়ী করার জন্য কিছু পদক্ষেপ গ্রহণ করেন।

রাজনৈতিক দলবিধি আদেশ

জিয়ার সামরিক সরকারের বৈশিষ্ট্য

বাংলাদেশের দ্বিতীয় সংসদ বসে ১৯৭৯ সালে জেনারেল জিয়াউর রহমান প্রবর্তিত রাষ্ট্রপতি শাসিত সরকার পদ্ধতির আওতায়। ১৯৭৫ সালের ৭ নভেম্বর সামরিক প্রধান হিসেবে পুনঃনিযুক্তি লাভের পর জেনারেল জিয়া ক্ষমতার মধ্যমণি হন এবং সাধারণ নির্বাচনের মাধ্যমে ক্ষমতা হস্তান্তর ও গণতান্ত্রিক ব্যবস্থা পুনঃস্থাপনের অঙ্গীকার করেন। ১৯৭৬ সালের জুলাই থেকে সীমিত রাজনৈতিক কর্মকাণ্ড চালানোর অনুমতি প্রদানের সিদ্ধান্ত গৃহীত হয় এবং এ লক্ষ্যে রাজনৈতিক দল বিধি বা 'Political Parties Regulation' পাস করে ঘরোয়া রাজনীতি চালু করা হয়। বিধি অনুসারে রাজনৈতিক কর্মকাণ্ড চালানোর জন্য রাজনৈতিক দলগুলোকে সরকারের অনুমোদন গ্রহণের আবেদন করতে হতো এবং সে উদ্দেশ্যে নিজ নিজ দলের সংবিধান, কর্মসূচি এবং মেনিফেস্টো যথারীতি দাখিল করতে হতো। এভাবে ১৯৭৬ সালের শেষ নাগাদ আবেদনকারী ষাটটি রাজনৈতিক দলের মধ্যে একুশটিকে অনুমতি প্রদান করা হয়।

সামরিক শাসকরা ক্ষমতায় অধিষ্ঠিত হয়ে সাধারণত যে কাজগুলো করে তা হলো :

১. সামরিক আইনে নির্বাচন পিছিয়ে দেওয়া
২. নতুন রাজনৈতিক দল গঠন
৩. গণভোটের মাধ্যমে ক্ষমতার বৈধতা প্রদান
৪. ভোট কারচুপি করে সমস্যার সৃষ্টিকরণ
৫. রাজনীতিতে ধর্মের ব্যাপক ব্যবহার

জেনারেল জিয়াউর রহমান ক্ষমতাকে দীর্ঘায়িত করার জন্য অসংখ্য বেসামরিক পদে সেনা কর্মকর্তাদের নিয়োগ দেন। আবার তিনি সামরিক-বেসামরিক আমলাদের সাথে সুসম্পর্ক বজায় রাখেন। সামরিক বাহিনীর মধ্যে নিজের অবস্থানকে জনপ্রিয় করে তুলতে জিয়া সামরিক খাতে সর্বোচ্চ বাজেট বরাদ্দ দেন। বঙ্গবন্ধুর আমলের ১৯৭৪-১৯৭৫ সালে সেনা বাজেট ছিল ৭০০ মিলিয়ন টাকা। জিয়া তা বাড়িয়ে প্রায় ২১০০ মিলিয়ন টাকা করেন। নতুন সেনা ডিভিশন গঠন, গোয়েন্দা তৎপরতা বৃদ্ধি এবং অন্যান্য পদক্ষেপ গ্রহণ করেন। জিয়াউর রহমান একটি

শক্তিশালী সমর্থকগোষ্ঠী তৈরিতে সবচেয়ে বেশি গুরুত্ব দিয়েছেন মতাদর্শগত পরিবর্তনে (ideological shipment)। বস্তুত ইসলামকে ভিত্তি করেই জিয়া ৮০ ভাগ মুসলিম অধ্যুষিত অঞ্চলে নিজের একটি শক্তিশালী সমর্থক গোষ্ঠী তৈরি করেন। এক্ষেত্রে তিনি বাংলাদেশে স্বীকৃত যুদ্ধাপরাধী শাহ আজিজুর রহমান, মওলানা আব্দুল মান্নানসহ বেশ কয়েকজন রাজাকারকে মন্ত্রিসভায় স্থান দেন সরাসরি দালাল আইন প্রত্যাহারের মাধ্যমে। একজন মুক্তিযোদ্ধা হয়েও জিয়া এটি করেছিলেন একটি শক্তিশালী 'আদর্শিক সমর্থক গোষ্ঠী' তৈরির জন্য। ফলে যারা ঐতিহাসিকভাবে বাঙালি জাতীয়তাবাদী আন্দোলনের বিরোধী' স্বাধীনতা যুদ্ধে পরাজিত শক্তি, যারা ছত্রভঙ্গ হয়ে দেশান্তরী নতুবা আত্মগোপনে ব্যস্ত জেনারেল জিয়ার পৃষ্ঠপোষকতায় তারা রাজনীতিতে দারুণভাবে ঘুরে দাঁড়ায়। পাকিস্তানের জেনারেল জিয়াউল হকের মতো জিয়াউর রহমান ক্ষমতায় পাকাপোক্তভাবে টিকে থাকার জন্য জনগণের ধর্মীয় অনুভূতিকে যথেচ্ছভাবে ব্যবহার করেন। বাংলাদেশ রাষ্ট্রকে ইসলামীকরণের প্রক্রিয়া জিয়াউর রহমানের আমল থেকেই জোরেসোরে শুরু হয়। জিয়া খন্দকার মোশতাক ও বিচারপতি সায়েমের ঘোষণা অনুযায়ী ১৯৭৭ সালের ফেব্রুয়ারি মাসে সাধারণ নির্বাচন পিছিয়ে দেন। তিনি ক্ষমতাকে সুসংহত করতে প্রথমে আয়োজন করেন 'হ্যাঁ-না' ভোট, পরে সামরিক উর্দি গায়ে আয়োজন করেন রাষ্ট্রপতি নির্বাচন। আরও পরে আয়োজন করেন সংসদ নির্বাচন। তারপরই জিয়া সেনা বাহিনীর প্রধানের পদ থেকে পদত্যাগ করেন। অর্থাৎ ক্ষমতাকে পরিপূর্ণভাবে নিশ্চিত না করে জিয়া গা থেকে উর্দি খোলেন নি। এটি কেবল প্রতিকী বিষয় নয়; বরং এটি ছিল ক্ষমতাকে চূড়ান্তভাবে ব্যবহারের এবং ঘটনা প্রবাহকে নিয়ন্ত্রণের সবচে' কার্যকর অস্ত্র।

১৯ দফা, খাল খনন কর্মসূচি, রাজনৈতিক দল গঠন, গণভোটসহ বিভিন্ন রাজনৈতিক কর্মসূচির মাধ্যমে জেনারেল জিয়াউর রহমান বেসামরিকীকরণের প্রক্রিয়া শুরু করেছিলেন। জেনারেল জিয়া ১৯৭৭ সালের ৩০ মে এক জাতীয় গণভোটের মাধ্যমে নিজ অবস্থান ও কর্মসূচির পক্ষে জনসমর্থন লাভের প্রয়াস পান। ১৯৭৭ সালের ৩০ মে অনুষ্ঠিত গণভোটে জিয়াউর রহমান ৯৮.৮৭% সমর্থনসূচক ভোট আদায় করতে সমর্থ হন। রাষ্ট্রবিজ্ঞানী তালুকদার মনিরুজ্জামান এ গণভোটেকে সমালোচনা করে বলেছেন, "এ ভোটের তেমন কোনো গ্রহণযোগ্যতা নেই, কেননা সামরিক শাসনের সময় সব জেনারেলই ৯৯ শতাংশ ভোট পেয়ে থাকেন; এটি এক ধরনের সামরিক ফ্যাশান।"

তৃতীয় বিশ্বের অনেক দেশেই সামরিক শাসকরা অবৈধ ক্ষমতা দখলের পর গণভোটের আয়োজন করে। উদ্দেশ্য ক্ষমতা দখলকে একপ্রকার বৈধতা প্রদান করা।

সংবিধান সংশোধনী

জিয়াউর রহমান বিচারপতি সায়েমের কাছ থেকে বলপূর্বক রাষ্ট্রপতির পদ দখলের তিন দিনের মাথায় ২৩ এপ্রিল, ১৯৭৭ সামরিক ফরমান জারি করে মুক্তিযুদ্ধের চেতনায় প্রণীত বাহাত্তরের সংবিধানের আমূল পরিবর্তন করেন। সংশোধনী আদেশে সংবিধানে নিম্নোক্ত প্রধান প্রধান পরিবর্তন সাধিত হয়–

ক) বাংলাদেশের নাগরিক 'বাঙালি নয়' বাংলাদেশী হিসেবে পরিচিত হবে।
খ) সংবিধানের শুরুতে প্রস্তাবনার পূর্বে 'বিসমিল্লাহির রাহমানির রাহিম' যুক্ত হয়।
গ) রাষ্ট্রীয় মূলনীতি 'ধর্মনিরপেক্ষতা' বিলুপ্ত করে বলা হলো, 'সর্বশক্তিমান আল্লাহর উপর পূর্ণ আস্থা ও বিশ্বাসই হবে যাবতীয় কার্যাবলির ভিত্তি'।

ঘ) ১৯৭২ সালের সংবিধানের অন্যতম মূলনীতি সমাজতন্ত্রের ব্যাখা দেয়া হয় অর্থনৈতিক ও সামাজিক ক্ষেত্রে ন্যায় বিচার হিসাবে।

ঙ) বৈদেশিক সম্পর্ক বিষয়ে বলা হলো, 'রাষ্ট্র ইসলামি সংহতির ভিত্তিতে মুসলিম দেশসমূহের মধ্যে ভ্রাতৃত্ব সম্পর্ক সংহত, সংরক্ষণ এবং জোরদার করতে সচেষ্ট হবেন।'

চ) 'মুক্তি সংগ্রামের' পরিবর্তে 'স্বাধীনতা যুদ্ধ' ব্যবহারের সিদ্ধান্তহয়।

জিয়ার সংবিধান সংশোধনের প্রধান উদ্দেশ্য ছিল মুক্তিযুদ্ধ বা আওয়ামী লীগ বিরোধী দল ও ব্যক্তির সমর্থন লাভ করা। সামগ্রিকভাবে বাংলাদেশ রাষ্ট্র ও জনগণের পরিচয়ের ওপর ধর্মীয় ছাপ প্রকট করে তোলা। মুক্তিযুদ্ধের চেতনার বিপরীতে পাকিস্তানি চেতনাকে ফিরিয়ে এনে জিয়া তাঁর ক্ষমতাকে স্থায়ী করতে চেয়েছেন। অপ্রয়োজনীয় সংশোধনীর মাধ্যমে সংবিধানের মৌলিকত্ব নষ্ট করা হয়।

প্রকাশ্য রাজনৈতিক কার্যকলাপ শুরুর অনুমতি

রাষ্ট্রপতি নির্বাচন ১৯৭৮

জিয়াউর রহমান সরকারের বেসামরিকীকরণ কার্যক্রমের দ্বিতীয় পদক্ষেপ ছিল রাষ্ট্রপতি নির্বাচন। প্রেসিডেন্ট ও প্রধান সামরিক আইন প্রশাসক জিয়াউর রহমান এক ঘোষণায় নির্বাচনের তারিখ ঘোষণা করেন। নির্বাচন অনুষ্ঠানে পদক্ষেপ হিসেবে ১ মে থেকে প্রকাশ্য রাজনৈতিক কার্যকলাপ শুরু করার অনুমতি দেয়া হয়। নির্বাচনে প্রতিদ্বন্দ্বিতার উদ্দেশ্যে সরকারী পৃষ্ঠপোষকতায় ন্যাপ (পিকিং পন্থী), ধর্মভিত্তিক দল, প্রাক্তন সেনা কর্মকর্তা, আমলাদের নিয়ে গঠিত হয় "জাতীয়তাবাদী গণতান্ত্রিক দল' (জাগদল)। জাগদলের প্রার্থী হিসেবে জিয়াউর রহমান প্রেসিডেন্ট পদে প্রতিদ্বন্দ্বিতা করেন।

গণতান্ত্রিক ঐক্য জোট গঠিত

দীর্ঘদিন সামরিক শাসন ও রাজনীতি নিষিদ্ধ থাকায় বিরোধী রাজনীতি নিস্ক্রিয় ছিল। ফলে অল্পসময়ের ব্যবধানে নির্বাচন ঘোষণায় বিরোধী দলের পক্ষে এককভাবে নির্বাচনে অংশ নেয়ার ক্ষমতা ও শক্তি কোনটাই ছিল না। এই অবস্থায় ঐক্যবদ্ধ নির্বাচনের লক্ষ্যে বাংলাদেশ আওয়ামী লীগ, জাতীয় জনতাপার্টি, গণআজাদী লীগ এবং অধ্যাপক মোজাফফর আহম্মদের নেতৃত্বাধীন পরিচালিত ন্যাপ সমন্বয়ে গঠিত হয় "গণতান্ত্রিক ঐক্যজোট" । ঐক্যজোটের প্রার্থী হিসেবে জাতীয় জনতা পার্টির প্রধান মুক্তিযুদ্ধের প্রধান সেনাপতি জেনারেল (অবঃ) এম.এ.জি. ওসমানী রাষ্ট্রপতি পদে প্রতিদ্বন্দ্বিতা করেন।

নানা রকম প্রতিকূলতা সত্ত্বেও আওয়ামী লীগ এই নির্বাচনে অংশ নেয়। জিয়ার সঙ্গে অসম প্রতিদ্বন্দ্বিতায় ওসমানী যে পেরে উঠবেন না এ নিয়ে কোনো সন্দেহ ছিল না। জিয়া ও তাঁর সমর্থকদের কাছে বড় চ্যালেঞ্জ ছিল নির্বাচনকে দেশে-বিদেশে কীভাবে গ্রহণযোগ্য করা যায়। জিয়া কারচুপির মাধ্যমে প্রদত্ত ভোটের শতকরা ৭৬.৬৩ ভাগ ভোট পেয়ে রাষ্ট্রপতি নির্বাচিত হন। ওসমানীকে দেখানো হয়েছিল মাত্র ২১.৭০ ভাগ ভোট। এই নির্বাচনের পরেও সামরিক শাসন থাকায় জনগণ গণতান্ত্রিক অধিকার ফিরে পায়নি।

জিয়া প্রেসিডেন্ট নির্বাচিত

নির্ধারিত তারিখে (৩ জুন) সামরিক আইনের আওতায় রাষ্ট্রপতি নির্বাচন অনুষ্ঠিত হয়।

জাতীয় সংসদ নির্বাচন ১৯৭৯

রাষ্ট্রপতি পদে বিজয়ী হবার পর জিয়াউর রহমান জাতীয় সংসদ নির্বাচনের ব্যবস্থা করেন। ১৯৭৯ সালের ১৮ ফেব্রুয়ারি জাতীয় সংসদ নির্বাচনের তারিখ ঘোষণা করা হয়।

রাষ্ট্রপতি পদে বিজয়ী হবার পর জিয়াউর রহমান জাতীয় সংসদ নির্বাচনের ব্যবস্থা করেন। ১৯৭৯ সালের ১৮ ফেব্রুয়ারি জাতীয় সংসদ নির্বাচনের তারিখ ঘোষণা করা হয়। ইতোপূর্বে জারিকৃত সামরিক আইনে "রাজনৈতিক দল গঠন ও পরিচালনা" বিধিটি বাতিল ঘোষণা করা হয়। ফলে পুনরায় রাজনীতি ও রাজনৈতিক সংগঠন করার অবাধ সুযোগ সৃষ্টি হয়। ক্ষমতা দখলের পর অন্যান্য সামরিক শাসকদের ন্যায় জেনারেল জিয়াও রাজনৈতিক দল গঠনের চিন্তা করেছেন। আওয়ামী লীগ বিরোধী শিবিরের রাজনৈতিক সমর্থন নিয়ে জিয়ার যাত্রা শুরু। মুক্তিযুদ্ধের সময় পাকিস্তানপন্থী জামায়াতে ইসলামী, নেজামে ইসলামী, মুসলিম লীগসহ ধর্মীয় দলগুলোর বাংলাদেশ বিরোধী ভূমিকার কারণে স্বাধীনতার পর ধর্মভিত্তিক রাজনীতি নিষিদ্ধ ঘোষণা করা হয়। জিয়া দালাল আইন বাতিল এবং ধর্মভিত্তিক রাজনৈতিক দল গঠনের সাংবিধানিক অন্তরায় দূর করে স্বাধীনতা বিরোধীদের রাজনীতি করার সুযোগ করে দেন। জিয়া ১৯৭৮ সালের ১ সেপ্টেম্বর বাংলাদেশ জাতীয়তাবাদী দল (বিএনপি) নামে একটি নতুন রাজনৈতিক দল গঠন করেন। স্বাধীনতাবিরোধী, বামপন্থী, ডানপন্থী বিভিন্ন দল ও ব্যক্তি বিএনপিতে যোগ দেয়।

১৯৭৯ সালের ১৮ ফেব্রুয়ারি জাতীয় সংসদ নির্বাচন অনুষ্ঠিত হয়। নির্বাচনে প্রায় সবগুলি রাজনৈতিক দল অংশ গ্রহণ করে। সামরিক আইনের অধীনে অনুষ্ঠিত এই নির্বাচনে প্রায় ৫১% ভোটার ভোট প্রদান করে। বাংলাদেশ জাতীয়তাবাদী দল প্রদত্ত ভোটের ৪১% পেয়ে ৩০০ আসনের মধ্যে ২০৭টি আসনে জয়ী হয়। প্রধান প্রতিদ্বন্দ্বি আওয়ামী লীগ (আব্দুল মালেক উকিল এর নেতৃত্বাধীন) প্রায় ২৫% ভোট পেয়ে ৩৯টি আসন এবং মুসলিম লীগ ও ইসলামিক ডেমোক্রেটিক লীগ যৌথভাবে ১০% ভোট পেয়ে ২০টি আসন লাভ করে। এছাড়া জাসদ ৮টি এবং মিজান চৌধুরীর নেতৃত্বাধীন আওয়ামী লীগ ২টি সহ অন্যান্য দল আরো ১০টি এবং নির্দলীয় প্রার্থী ১৬টি আসন লাভ করে।

সংবিধানের পঞ্চম সংশোধনী গৃহীত এবং সামরিক আইন প্রত্যাহার

১৯৭৯ সালের ২ এপ্রিল নবনির্বাচিত জাতীয় সংসদের প্রথম অধিবেশন বসে। অধিবেশনের দ্বিতীয় দিন অর্থাৎ ৪ এপ্রিল *বাংলাদেশ সংবিধান (পঞ্চম সংশোধনী) আইন,* ১৯৭৯ বিল উত্থাপন করা হয়। এই বিলটি ছিল ১৯৭৫ সালের ১৫ আগস্ট হতে ১৯৭৯ সালের ৯ এপ্রিল তারিখের মধ্যে সামরিক শাসনামলে প্রণীত সকল ফরমান অনুমোদন ও পাশ সংক্রান্ত। জাতীয় সংসদে বি.এন.পি র সংখ্যাগরিষ্ঠতার ভিত্তিতে ৬ (১৯৭৯) এপ্রিল সংসদে এই বিল পাস ও গৃহীত হয়। ১৯৭৯ সালের ৯ এপ্রিল তারিখে সামরিক আইন প্রত্যাহার করে সাংবিধানিক শাসন চালু করা হয়। পঞ্চম সংশোধনীর মাধ্যমে বহুদলীয় ব্যবস্থা পুনঃপ্রবর্তিত হয়; তবে পূর্বের ন্যায় রাষ্ট্রপতি শাসন ব্যবস্থা বহাল থাকে।

জিয়া সরকারের অন্যান্য কার্যক্রম

১৯৭৫ সালে বঙ্গবন্ধু হত্যাকাণ্ডের পর বাংলাদেশের রাজনীতিতে উদ্ভূত এক বিশেষ পরিস্থিতিতে জিয়াউর রহমান রাষ্ট্র ক্ষমতা দখল করেন। তিনি রাজনীতিতে স্থিতিশীলতা ফিরিয়ে আনতে সচেষ্ট হন। অর্থনৈতিক ক্ষেত্রে ও শিল্পায়নের দিকে বিশেষ জোর দেয়া হয়। এক্ষেত্রে বেসরকারী খাতকে অগ্রাধিকার দেয়ায় বাংলাদেশে বেসরকারী উদ্যোগে বহু রপ্তানিমুখী শিল্প প্রতিষ্ঠিত হয়। গ্রাম প্রধান বাংলাদেশের গ্রামীণ জনগোষ্ঠির উন্নতির লক্ষ্যে জিয়াউর রহমান ১৯৮০ সালে 'স্বনির্ভর গ্রাম সরকার পরিকল্পনা' গ্রহণ করেন। গ্রামীণ খাদ্য উৎপাদন বৃদ্ধি, আইন শৃঙ্খলা পরিস্থিতি নিয়ন্ত্রণ এবং জনসংখ্যারোধ কার্যক্রমে অংশগ্রহণ করা গ্রাম

সরকারের অন্যতম প্রধান দায়িত্ব ছিল। তাছাড়া কৃষি উৎপাদন বৃদ্ধির লক্ষ্যে 'খাল খনন কর্মসূচি' গ্রহণ জিয়া সরকারের একটি আলোচিত পদক্ষেপ। যদিও এ পদক্ষেপগুলো বাস্তবে খুব সাফল্য লাভ করেনি। এছাড়া স্বাধীনতা বিরোধী শাহ আজিজুর রহমানকে প্রধানমন্ত্রী ও আরো কয়েকজন দালালকে মন্ত্রী নিয়োগ করে প্রশাসন মুক্তিযুদ্ধ চেতনা বিরোধীদের আসন করে দেন। স্বাধীনতা বিরোধীদের পুনর্বাসন বাংলাদেশের ইতিহাসে অশুভ ধারার রাজনীতি চালু করে।

জিয়াউর রহমানের হত্যাকাণ্ড

১৯৭৫ সাল থেকে ১৯৮১ সাল পর্যন্ত জিয়াউর রহমান ক্ষমতায় অধিষ্ঠিত ছিলেন। ১৯৮১ সালের ৩০ মে রাষ্ট্রপতি জিয়াউর রহমান চট্টগ্রামে সফররত অবস্থায় এক সেনা বিদ্রোহে নিহত হন।

সার-সংক্ষেপ

বাংলাদেশের রাজনীতিতে জিয়াউর রহমানের শাসনকাল সামরিক সরকারকে বেসরকারী করণের প্রক্রিয়া দেখা যায়। দৃশ্যত বহুদলীয় শাসন কায়েম করলেও দল ভাঙ্গা গড়ার মাধ্যমে প্রকৃত গণতন্ত্র এ সময় ব্যাহত হয়। অর্থনৈতিক ক্ষেত্রে কিছু কিছু পদক্ষেপের দ্বারা দেশে অর্থনৈতিক সমৃদ্ধি আনার প্রচেষ্টা নেন। আইন শৃংখলা পরিস্থিতির বেশ কিছুটা অগ্রগতি হয়। তবে তার হত্যাকাণ্ডের মাধ্যমে হত্যার রাজনীতির অশুভ তৎপরতা আবারো শুরু হয়।

পাঠোত্তর মূল্যায়ন ঃ ১১.৩

নৈর্ব্যক্তিক প্রশ্ন

১. রাষ্ট্রপতি গণভোট অনুষ্ঠিত হয়
   ক) ৩০ আগস্ট ১৯৭৬, খ) ২৫ মে, ১৯৭৭
   গ) ৩০ মে, ১৯৭৭ ঘ) ২৭ মে, ১৯৭৭

২. রাষ্ট্রপতি নির্বাচন অনুষ্ঠিত হয়
   ক) ৪ জুন ১৯৭৮ খ) ৩ জুন ১৯৭৮
   গ) ৩ জুন ১৯৭৭ ঘ) ৫ মে ১৯৭৮

৩. বাংলাদেশ জাতীয়তাবাদী দল (বি.এন.পি) গঠিত হয়
   ক) ১৯৭৮ সালের জুন মাসে খ) ১৯৭৭ সালের ৬ এপ্রিল
   গ) ১৯৭৮ সালের আগস্ট মাস ঘ) ১৯৭৯ সালের জানুয়ারি মাসে

৪. বাংলাদেশ সংবিধানের 'পঞ্চম সংশোধনী' গৃহীত হয়
   ক) ১৯৭৯ সালের ৬ এপ্রিল খ) ২৫ মে, ১৯৭৭
   গ) ৩০ মে, ১৯৭৭ ঘ) ২৭ মে, ১৯৭৭

সংক্ষিপ্ত উত্তর প্রশ্ন

১. জিয়াউর রহমানের ক্ষমতা গ্রহণের পটভূমি বর্ণনা করুন।
২. ১৯৭৮ সালে অনুষ্ঠিত রাষ্ট্রপতি নির্বাচনে দুইজন রাষ্ট্রপতি প্রার্থী ও দলের নাম লিখুন।
৩. ১৯৭৯ সালের জাতীয় সংসদ নির্বাচনে বি.এন.পি শতকরা কত ভোট এবং কয়টি আসনে জয়ী হয়? লিখুন।
৪. সংবিধানের পঞ্চম সংশোধনীর অন্যতম বৈশিষ্ট্য কী?
৫. সামরিক শাসকদের ৩টি বৈশিষ্ট্য লিখুন।

এরশাদের শাসনামল (১৯৮২-১৯৯০ খ্রিঃ)

উদ্দেশ্য

এই পাঠ শেষে আপনি —

- এরশাদের ক্ষমতাগ্রহণ ও সামরিক আইন জারির পটভূমি বর্ণনা দিতে পারবেন।
- এরশাদ সরকারের প্রশাসনিক পুনর্বিন্যাস সম্পর্কে বিবরণ দিতে পারবেন।
- সামরিক সরকারের বেসামরিকীকরণ প্রক্রিয়া সমূহের ব্যাখ্যা দিতে পারবেন।

রাষ্ট্রপতি নির্বাচন, ১৯৮২ খ্রিস্টাব্দে সামরিক আইন জারি এবং লেঃ জেনারেল এরশাদের ক্ষমতা দখল

রাষ্ট্রপতি জিয়াউর রহমান নিহত হওয়ার পর উপ রাষ্ট্রপতি বিচারপতি আবদুস সাত্তার অস্থায়ী রাষ্ট্রপতির দায়িত্বভার গ্রহণ করেন। রাষ্ট্রপতি নির্বাচনে তিনি বিএনপির প্রার্থী হিসেবে বাংলাদেশ আওয়ামী লীগ মনোনীত প্রার্থী ড. কামাল হোসেনকে পরাজিত করে রাষ্ট্রপতির দায়িত্ব গ্রহণ করেন। কিন্তু বিচারপতি সাত্তার নির্বাচিত হওয়ার মাত্র চার মাসের মধ্যে ১৯৮২ সালে ২৪ মার্চ সেনাবাহিনীর প্রধান লেফটেন্যান্ট জেনারেল এরশাদের নেতৃত্বে সেনাবাহিনী ক্ষমতা দখল করে। রাষ্ট্রপতি বিচারপতি সাত্তার অপসারিত হন এবং এরশাদ নিজেকে প্রধান সামরিক আইন প্রশাসক হিসেবে ঘোষণা করেন। একই সঙ্গে সংবিধান স্থগিত, জাতীয় সংসদ বাতিল এবং মন্ত্রিপরিষদ ভেঙ্গে দেয়া হয়। সামরিক সরকার দেশে সকল প্রকার রাজনৈতিক কর্মকাণ্ড সম্পূর্ণ নিষিদ্ধ ঘোষণা করে।

এরশাদ সরকারের প্রশাসনিক পুনর্বিন্যাস

১৯৮২ সালের মার্চ মাসে সামরিক আইন জারির পর এরশাদ সরকার বিভিন্ন পরিকল্পনা গ্রহণ করেন।

প্রথমত ঃ সরকারী ব্যয় হ্রাস ও দ্রুত কর্মসম্পাদনের উদ্দেশ্য ৪৫টি মন্ত্রণালয়কে ২৬টি এবং ৬০টি বিভাগকে ৪২টি বিভাগে পুর্নবিন্যস্ত করা হয়।

দ্বিতীয়ত ঃ সরকার ব্রিটিশ আমলে তৈরী থানা প্রশাসন ব্যবস্থা বাতিল করে উপজেলা ব্যবস্থা চালু করে। সে লক্ষ্যে প্রাথমিকভাবে ৪৫টি থানাকে উপজেলা পর্যায়ে উন্নীত করা হয়। পর্যায়ক্রমে সমগ্র দেশের থানাগুলিকে উপজেলায় রূপান্তরিত করা হয়।

তৃতীয়ত ঃ বিচার ব্যবস্থা সাধারণ মানুষের কাছে পৌঁছে দেয়ার লক্ষ্যে প্রতিটি উপজেলায় স্বতন্ত্র ম্যাজিস্ট্রেট ও মুন্সেফ আদালত প্রতিষ্ঠা করা হয়। তাছাড়া দেশের বৃহৎ জেলার হাইকোর্টের স্থায়ী বেঞ্চ স্থাপনের সিদ্ধান্ত নেয়া হয়।

চতুর্থত ঃ প্রশাসনিক বিকেন্দ্রীকরণের ধাপ হিসেবে দেশের সকল মহকুমাকে জেলায় রূপান্তরিত করার সুপারিশ করা হয়।

উন্নয়ন কর্মসূচি ১৮ দফা, সামরিক সরকারকে বেসামরিকীকরণ প্রক্রিয়া

১৯৮২ সালে সামরিক আইন জারি করে জে. এরশাদ জাতির উদ্দেশ্য ঘোষণা করেছিলেন যে, তাঁর লক্ষ্য অতিদ্রুত সামরিক আইনের অবসান ঘটিয়ে একটি নির্বাচিত সরকার প্রতিষ্ঠা করা। সে লক্ষ্যে সরকার নিজের সুবিধা মত বিভিন্ন পর্যায়ে বেসামরিকীকরণ প্রক্রিয়া শুরু করে। এ সকল প্রক্রিয়ার সঙ্গে এরশাদ নিজের ১৮ দফা উন্নয়ন কর্মসূচি ঘোষণা করেন। এরশাদ

নানাভাবে নিজেকে একজন জনদরদি নেতা হিসেবে উপস্থাপনের চেষ্টা করেছেন। সভা-সমাবেশ ও সরকারি প্রচারমাধ্যমে বলা হয়েছে এরশাদের উন্নয়ন কর্মসূচির লক্ষ্য গ্রামীণ জনগোষ্ঠীর ভাগ্যের পরিবর্তন। ১৯৮৩ সালের ১৭ মার্চ তিনি জনগণের সার্বিক কল্যাণে ১৮ দফা র্কসূচি ঘোষণা করেন। ১৮ দফা কর্মসূচির অন্যতম ছিল গ্রামীণ উন্নয়ন সাধন, খাদ্যে স্বয়ংসম্পূর্ণতা অর্জন, জনসংখ্যা নিয়ন্ত্রণ, ভূমিসংস্কার, বেসরকারী খাতের শিল্পসমূহকে উৎসাহদান, দুর্নীতির অবসান ঘটানো এবং নারী অধিকার নিশ্চিত করা। এছাড়া জাতীয় সংহতি থেকে শুরু করে পররাষ্ট্রনীতি পর্যন্ত সবকিছুই এর অন্তর্ভুক্ত ছিল।

সরকারি টেলিভিশন, রেডিও, সংবাদপত্রে উন্নয়ন কর্মকাণ্ডের ব্যাপক প্রচারণা চালানো হলেও সামগ্রিকভাবে তাঁর আমলে দেশের অর্থনৈতিক অবস্থা মোটেই সন্তোষজনক ছিল না। প্রকৃত উন্নয়ন না হওয়ার প্রধান কারণ দুর্নীতি আর সীমাহীন লুটপাট। এরশাদের সময়ে বৈদেশিক সাহায্য নির্ভরতা হতাশাজনকভাবে বৃদ্ধি পেয়েছে। ১৯৮০-৮১ সাল উন্নয়ন বাজেটের ৬৫ শতাংশ ছিল বিদেশি সাহায্যনির্ভর, ১৯৮৮-৮৯ সালে বৃদ্ধি পেয়ে দাঁড়ায় ১২৬.৩ শতাংশ। ঋণখেলাপি সংস্কৃতিতে সামরিক-বেসামরিক আমলা ও দলছুট রাজনীতিবিদরা লাভবান হয়েছেন। খাদ্য উৎপাদন, জিডিপি, গড় প্রবৃদ্ধি সব ছিল নিম্নগামী। তবে সামরিক খাতে ব্যয় বৃদ্ধি পেয়েছে। কারণ নিজের ক্ষমতার ভিত শক্তিশালী করার জন্য ব্যাপকভাবে সামরিক বাহিনীর সুযোগ-সুবিধা বৃদ্ধি করেছিলেন।

বৈদেশিক সম্পর্কের ক্ষেত্রে জেনারেল এরশাদ নতুন কিছু করেননি। তিনি জেনারেল জিয়ার পথই অনুসরণ করেন। ভারতের বিপরীতে চীনের সঙ্গে সুসম্পর্ক আরও দৃঢ় করার উদ্যোগ নেন। বিশেষভাবে সামরিক বাহিনীর প্রশিক্ষণ, অস্ত্রশস্ত্রের জন্য চীনের ওপর নির্ভরশীলতা বৃদ্ধি পায়। পাকিস্তান, সৌদি আরব, ইরাকসহ মুসলিম বিশ্বের সঙ্গে সৌহার্দ্যপূর্ণ সম্পর্ক অব্যাহত থাকে।

বৈদেশিক সম্পর্কের ক্ষেত্রে এরশাদের একটি বড় সাফল্য হলো সার্ক গঠন। দক্ষিণ এশিয়ার সাতটি প্রতিবেশী রাষ্ট্র একত্রিত হয়ে প্রতিষ্ঠা করে দক্ষিণ এশিয় আঞ্চলিক সহযোগিতা সংস্থা (সার্ক)। এই সংস্থার প্রথম শীর্ষ সম্মেলন ১৯৮৫ সালের ডিসেম্বরে ঢাকা অনুষ্ঠিত হয়।

হ্যাঁ/ না ভোট অনুষ্ঠিত, রাষ্ট্রপতি গণভোট ১৯৮৫

সামরিক শাসকদের গতানুগতিক প্রথা অনুযায়ী এরশাদের সামরিক সরকারও জনগণের বৈধতা লাভের লক্ষ্যে গণভোটের আয়োজন করে । সাংবিধানিক প্রক্রিয়ার রাষ্ট্রপতি নির্বাচন না হওয়া পর্যন্ত নিজের শাসন ক্ষমতা অব্যাহত রাখা এবং তার গৃহীত কর্মসূচির প্রতি জনমত যাচাইয়েরর উদ্দেশ্যে এই গণভোটের আয়োজন করা হয়। ১৯৮৫ সালের ২১ মার্চ গণভোট (হ্যাঁ/না) অনুষ্ঠিত হয়। স্বাভাবিক কারণেই জনগণ এই নির্বাচনে কোনো আগ্রহ দেখায় নি। সামরিক সরকারের আস্থা যাচাইয়ের প্রশ্নে স্বাধীন বাংলাদেশে এটা ছিল দ্বিতীয় গণভোট। নির্বাচন কমিশনের ঘোষণা মতে এরশাদ শতকরা ৯৪.১৪ ভাগ হ্যাঁ সূচক ভোট লাভ করেন। সামরিক ও বেসামরিক আমলাদের কারসাজির কারণে তাঁর পক্ষে ভোট পাওয়া সম্ভব হয়।

এরশাদের রাজনৈতিক দল গঠন এবং সামরিক শাসন বিরোধী আন্দোলন

বেসামরিকীকরণের প্রক্রিয়ার দ্বিতীয় পদক্ষেপ হিসেবে ১৯৮৫ সালের ৮ ডিসেম্বর জাতীয় সংসদ নির্বাচনের দিন ধার্য করা হয়। ক্ষমতা দখলকে পাকাপোক্ত করার জন্য এরশাদ একটি রাজনৈতিক দলের প্রয়োজনীয়তা অনুভব করেন। নির্বাচনের প্রাক্কালে এরশাদ রাজনৈতিক দল

গঠনের লক্ষ্যে তাঁর পৃষ্ঠপোষকতায় ১৯৮৪ সালেই গঠিত হয় 'জনদল'। এই দলের অঙ্গসংগঠন হিসেবে গড়ে উঠে নতুন বাংলা ছাত্রসমাজ, নতুন বাংলা যুব সংহতি, নতুন বাংলা শ্রমিক ফেডারেশন ইত্যাদি। সুবিধাবাদী, দলছুট বিভিন্ন নেতাকর্মী নিয়ে জনদল গঠিত হয়। এরপর তিনি ১৯৮৫ সালের ১৬ আগস্ট প্রতিষ্ঠা করেন জাতীয় ফ্রন্ট জনসমর্থনহীন কিছু রাজনৈতিক দল ও নেতা ফ্রন্টে যোগ দেন। অবশেষে ১৯৮৬ সালের ১ জানুয়ারি জাতীয় নির্বাচনের প্রাক্কালে ১৯৮৬ সালে জনদল বিলুপ্ত ঘোষণা করে 'জাতীয় পার্টি' নামে একটি রাজনৈতিক দল গঠন করা হয়। কিন্তু জেনারেল এরশাদের সামরিক শাসন দেশের অন্যান্য রাজনৈতিক দল ও জনগণ নির্বিবাদে মেনে নেয়নি। শুরু থেকেই সামরিক শাসন বিরোধী ছাত্র অন্দোলন ব্যাপক দানা বেধে ওঠে।

সরকার বিরোধী ঐক্য জোট

ছাত্র আন্দোলনের পাশাপাশি আওয়ামী লীগের নেতৃত্বে গঠিত হয় এরশাদ বিরোধী ১৫ দলীয় ঐক্যজোট এবং বিএনপির নেতৃত্বে ৭ দলীয় ঐক্যজোট। এই অবস্থায় এরশাদ সরকার জাতীয় সংসদ নির্বাচনের তারিখ ঘোষণা করলে সামরিক বিরোধী রাজনৈতিক জোট ও ছাত্র সংগঠনগুলি সামরিক আইনের অধীনে নির্বাচনের তীব্র বিরোধিতা করে। বিরোধী জোট সামরিক সরকারের পদত্যাগ এবং নির্দলীয় ও নিরপেক্ষ সকরারের অধীনে নির্বাচনের দাবি তোলে এবং এ লক্ষ্যে ব্যাপক গণআন্দোলনের ডাক দেয়।

১৯৮৬ সালে সংসদ নির্বাচন, কারচুপির অভিযোগে নিবাচনী ফলাফল বর্জন

আন্দোলনের প্রেক্ষিতে সামরিক সরকার ১৯৮৬ সালের ৭ মে নির্বাচনের তারিখ পুনঃনির্ধারণ করে। একই সঙ্গে ঘোষণা করে যে, নির্বাচনে সামরিক সরকার নিরপেক্ষ ভূমিকা পালন করবে এবং নির্বাচনের পর জাতীয় সংসদের প্রথম অধিবেশনেই সামরিক আইন প্রত্যাহার করা হবে। উদ্ভুত পরিস্থিতিতে ১৫ দলীয় জোটের শরিক প্রধান আওয়ামী লীগ সহ জামায়তে ইসলামী, মুসলিম লীগ ও জাসদ নির্বাচনে অংশ গ্রহণের পক্ষে মতামত ব্যক্ত করে। কিন্তু বিএনপি সামরিক সরকারের অধীনে অনুষ্ঠিত নির্বাচন বর্জনের ঘোষণা দেয়। রাজনীতির এই দ্বিধাবিভক্ত অবস্থায় ১৯৮৬ সালের মে মাসের ৭ তারিখ অনুষ্ঠিত হয় তৃতীয় জাতীয় সংসদ নির্বাচন। নির্বাচনে সরকারি দল জাতীয় পার্টি ১৫০টি আসনে জয় লাভ করে। অপরদিকে আওয়ামী লীগ ৭৬টি আসনে জয়ী হয়ে দ্বিতীয় সংখ্যাগরিষ্ট দল হিসেবে আত্মপ্রকাশ করে। তবে নির্বাচনে ব্যাপক কারচুপি হয়েছে এরূপ অভিযোগ উত্থাপন করে নির্বাচনে অংশগ্রহণকারী বিরোধী জোট নির্বাচনের ফলাফল প্রত্যাখানসহ সংসদ অধিবেশন বর্জন করে। সামরিক সরকার বিরোধী আন্দোলন আরো জোরদার হয়ে ওঠে।

রাষ্ট্রপতি নির্বাচন

সরকার এবং বিরোধীদলের এরূপ মুখোমুখি অবস্থানের মধ্যেই এরশাদ ১৯৮৬ সালের ১৫ অক্টোবর রাষ্ট্রপতি নির্বাচনের তারিখ ঘোষণা করেন। জেনারেল এরশাদের বেসামরিকীকরণের সর্বশেষ পর্যায় ছিল রাষ্ট্রপতি নির্বাচন।

বিরোধী দলের নির্বাচন বর্জনের ডাক, জে. এরশাদ রাষ্ট্রপতি, রাষ্ট্রপতি নির্বাচন

এরশাদের সরকারের পদত্যাগের দাবিতে গড়ে ওঠা রাজনৈতিক আন্দোলন রাষ্ট্রপতি নির্বাচনের প্রাক্কালে আরো জোরদার হয়। এবার শেখ হাসিনা এবং খালেদা জিয়ার নেতৃত্বে পারিচালিত ৮ দলীয় (ইতোমধ্যে ১৫ দলীয় জোট ভেঙ্গে ৮ দলীয় জোট হয়) ও ৭ দলীয় জোট আসন্ন রাষ্ট্রপতি নির্বাচন বর্জনের ডাক দেয়। অবশেষে প্রধান প্রধান রাজনৈতিক দলের অংশগ্রহণ ছাড়াই জেনারেল এরশাদ রাষ্ট্রপতি নির্বাচনে প্রস্তুতি সম্পন্ন করেন। ১৯৮৬ সালের ১৫ অক্টোবর অনুষ্ঠিত রাষ্ট্রপতি নির্বাচনে জাতীয় পার্টি মনোনীত প্রার্থী হুসেইন মুহম্মদ এরশাদ বিপুল ভোটে জয় লাভ করেন। যে সকল অখ্যাত প্রার্থী নির্বাচনে প্রতিদ্বন্দ্বিতা করেন তাদের রাজনৈতিক কোনো ভিত্তি বা জনসমর্থন ছিল না। ফলে এই নির্বাচন কোনো অবস্থাই গ্রহণ যোগ্যতা অর্জন করেনি।

সার-সংক্ষেপ

জেনারেল এরশাদ ১৯৮২ সালে ক্ষমতা গ্রহণের পর থেকে তার সামরিক সরকারকে বৈধকরণের ও বেসামরিকীকরণের প্রয়াস নেন। কিন্তু দুর্নীতি, স্বেচ্ছাচারিতা এবং জনসমর্থনহীন নির্বাচন ইত্যাদির কারণে এরশাদ সরকার জনসমর্থন লাভ করতে পারেনি। ফলে কতিপয় সংস্কার সত্ত্বেও সরকার বিরোধী রাজনৈতিক আন্দোলন ঠেকানো যায়নি, বরং ক্রমান্বয়ে রাজনৈতিক অস্থিতিশীলতা বাড়তে থাকে। অবশেষে ১৯৯০ সালে সংঘটিত এক গণ অভ্যুত্থানে এরশাদ সরকারের পতন ঘটে।

পাঠোত্তর মূল্যায়ন ঃ ১১.৪

নৈর্ব্যক্তিক প্রশ্ন

১. জে. এরশাদ কত সালে সামরিক আইন জারি করেন–
   ক) ১৯৮২ সালের ২৪ মার্চ   খ) ১৯৮১ সালের ২৪ মার্চ
   গ) ১৯৮৩ সালের ১৫ আগস্ট   ঘ) ১৯৮১ সালের ৩০ মে

২. জেনারেল এরশাদ ঘোষিত উন্নয়ন কর্মসূচি ছিল–
   ক) ১৯টি   খ) ১৮টি
   গ) ২৫টি   ঘ) ১০টি

৩. এরশাদের নেতৃত্বে জাতীয় পার্টি গঠিত হয়–
   ক) ১৯৮৮ সালে   খ) ১৯৮৬ সালে
   গ) ১৯৮৪ সালে   ঘ) ১৯৮৮ সালে

সংক্ষিপ্ত উত্তর প্রশ্ন

১. ১৯৮২ সালে সামরিক আইন জারির পটভূমি বর্ণনা করুন।
২. এরশাদ সরকারের থানা প্রশাসন ব্যবস্থার পুর্নবিন্যাস ব্যাখ্যা করুন।
৩. এরশাদ সরকারের ১৮ দফা কর্মসূচি কী?

পাঠ ৫

১৯৯০ সালের গণঅভ্যুত্থান এবং এরশাদ সরকারের পতন

উদ্দেশ্য

এই পাঠ শেষে আপনি —

- সামরিক সরকার বিরোধী ছাত্র আন্দোলন সম্পর্কে বিবরণ দিতে পারবেন।
- এরশাদ সরকার বিরোধী রাজনৈতিক আন্দোলনের গতি-প্রকৃতি বিশ্লেষণ করতে পারবেন।
- ১৯৯০ খ্রিস্টাব্দের তত্ত্বাবধায়ক সরকারের রূপরেখা বর্ণনা করতে পারবেন।
- গণঅভ্যুত্থানে এরশাদ সরকারের পতনের কারণগুলি ব্যাখ্যা করতে পারবেন।
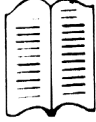
সামরিক শাসন বিরোধী ছাত্র আন্দোলন, সামরিক সরকার বিরোধী আন্দোলন

১৯৮২ সালে নির্বাচিত বৈধ সরকারকে উৎখাত করে জেনারেল এরশাদ সমগ্র দেশে সামরিক আইন জারি করেন। সামরিক আইন জারির পর থেকে প্রায় নয় বছর (১৯৮২-১৯৯০) তিনি রাষ্ট্রীয় ক্ষমতায় অধিষ্ঠিত ছিলেন। কিন্তু এই দীর্ঘ সময় ক্ষমতায় আসীন থাকাসত্ত্বেও তাঁর শাসনামলে দেশে রাজনৈতিক স্থিতিশীলতা ছিল না। তাঁর শাসনের শুরুতেই সামরিক আইন বিরোধী ছাত্র আন্দোলনের সূত্রপাত ঘটে। ছাত্র আন্দোলন জোরদার করার লক্ষ্যে বিভিন্ন ছাত্র সংগঠনের সমন্বয়ে ১৯৮৩ সালে গঠিত হয় "সর্বদলীয় ছাত্র সংগ্রাম পরিষদ"।

সরকার বিরোধী রাজনৈতিক জোট

এ সময় রাজনৈতিক দলগুলির মধ্যেও সরকারি বিরোধী ঐক্যবদ্ধ আন্দোলনের প্রয়োজনীয়তা অনুভূত হয়। ফলে আওয়ামী লীগের নেতৃত্বে প্রথমে গঠিত হয় ১৫ দলীয় ঐক্যজোট এবং বিএনপির নেতৃত্বাধীন ৭ দলীয় ঐক্যজোট। কিন্তু জোটগুলো মধ্যে মতপার্থক্য এবং চিন্তা চেতনার ভিন্নতার কারণে সামরিক সরকার বিরোধী আন্দোলন অভীষ্ঠলক্ষ্যে পৌঁছতে পারেনি। ১৯৮২ সাল থেকে ১৯৮৯ সাল পর্যন্ত প্রধান রাজনৈতিক দল ও জোট এরশাদ সরকারের পতন চাইলেও সার্বিকভাবে তারা ঐক্যবদ্ধ হতে ব্যর্থ হয়।

স্বেচ্ছাচার ও সরকারি নির্যাতন চরম আকার ধারণ, সরকার বিরোধী চূড়ান্ত আন্দোলন

প্রথম দিকের রাজনৈতিক আন্দোলন বিশেষ সাফল্য লাভ না করলেও আন্দোলনে জনমত সৃষ্টি অব্যাহত থাকে। অপরদিকে সরকার স্বেচ্ছাচারী কায়দায় দমন পীড়ন চালিয়ে বিরোধী আন্দোলন ব্যর্থ করার অপচেষ্টা চালায়। ১৯৯০ সালে এরশাদ সরকার বিরোধী আন্দোলন বিভিন্ন কারণে নতুন মাত্রা পায়। বিশেষ করে রাজনৈতিক নেতা কর্মীদের ওপর চরম পুলিশী নির্যাতন, একতরফাভাবে জাতীয় সংসদ ও উপজেলা নির্বাচন, সরকারের চরম দুনীতি প্রভৃতি কারণে সরকার পতনের আন্দোলন জনগণের আস্থা অর্জন করে।

আন্দোলনের নতুন রূপ

১৯৯০ সালের শুরুতে বিএনপির নেতৃত্বাধীন সাতদলীয় জোট জাতীয় সংসদভবনের চত্বরে বিক্ষোভ সমাবেশ কর্মসূচি পালনের মধ্য দিয়ে সরকার পতন আন্দোলনের নতুন কর্মসূচি ঘোষণা করে। অন্যান্য দলও স্বতন্ত্রভাবে অনুরূপ কর্মসূচির ঘোষণা দেয়। ইতোমধ্যেই আওয়ামী লীগের নেতৃত্বাধীন ১৫ দলীয় ঐক্যজোট ভেঙ্গে ৮ দলীয় জোটে রূপান্তরিত হয়। জানুয়ারি মাসের (১৯৯০) শুরুতে এ জোট সরকারের নিঃশর্ত পদত্যাগসহ সাত দফা দাবি পেশ করে।

ডাকসু নির্বাচন

৬ জুন, ১৯৯০ সালে ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয় কেন্দ্রীয় ছাত্র সংসদ (ডাকসু) নির্বাচন অনুষ্ঠিত হয়। ছাত্র আন্দোলনের প্রাণকেন্দ্র ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের কেন্দ্রীয় ছাত্র সংসদ নির্বাচনকে কেন্দ্র করে রাজনৈতিক তৎপরতা অধিক জোরদার হয়ে ওঠে। ডাকসু নির্বাচনে সরকার বিরোধী সংগঠন বাংলাদেশ জাতীয়তাবাদী ছাত্রদল নিরঙ্কুশ বিজয় অর্জন করে। ফলে সরকার বিরোধী ছাত্র আন্দোলন আরো সংগঠিত হওয়ার সুযোগ লাভ করে।

সংবিধানের দশম সংশোধনী

১৯৯০ সালের একতরফা ও গণসমর্থনহীন উপজেলা নির্বাচনের রেশ না যেতেই সরকার একই বছরের বাজেট অধিবেশন ঘোষণা করে। জাতীয় বাজেট অধিবেশনে সংবিধানের বিতর্কিত দশম সংশোধনী বিল উত্থাপিত হয়। রাজনৈতিক দলগুলি জাতীয় বাজেট প্রত্যাখান এবং একতরফা সংবিধান সংশোধনের তীব্র বিরোধিতা করে। জনগণের বিরোধিতা সত্ত্বেও জাতীয় সংসদে ১২ জুন (১৯৯০) দশম সংশোধনী আইন পাশ করা হয়। এ নিয়ে জনগণের মধ্যে ব্যাপক প্রতিক্রিয়া সৃষ্টি হয়।

ঐক্যবদ্ধ আন্দোলনের কর্মসূচি

এরূপ প্রেক্ষাপটে সরকার পতনের লক্ষ্যে এই প্রথম বারের মতো সকল বিরোধী দল একটি ঐক্যবদ্ধ কর্মসূচি ঘোষাণা করে। এ কর্মসূচির অন্যতম দাবী ছিল সরকারের নিঃশর্ত পদত্যাগ। এ আন্দোলনের সক্রিয়ভূমিকা পালন করে ডাকসু এবং ছাত্র সংগঠনগুলি। ডাকসু অক্টোবর মাসে এক ছাত্র কনভেনশন আহ্বান করে। এ কনভেনশনে এরশাদ সরকারের পতনের লক্ষ্যে সচিবালয় ঘেরাও সহ একমাসব্যাপী কর্মসূচির ডাক দেয়। এরশাদ সরকার পতনের অন্দোলনে ছাত্র নেতাদের মধ্যে অভূতপূর্ব ঐক্য সৃষ্টি হয়- যার ফলশ্রুতিতে গঠিত হয় “সর্বদলীয় ছাত্র ঐক্যজোট ”।

তত্ত্বাবধায়ক সরকারের রূপরেখা

ছাত্র ঐক্য জোট এবং রাজনৈতিক জোটগুলির সম্মিলিত আন্দোলনে সরকার বিপর্যস্ত হয়ে পড়ে। এই অবস্থায় ১৯ নভেম্বর সরকার বিরোধী রাজনৈতিক জোট নির্দলীয় তত্ত্বাধায়ক সরকারের রূপরেখা ঘোষণা করে। ঘোষিত রূপরেখায় বলা হয়।

১) সাংবিধানিক ধারা অনুসারে বিরোধী রাজনৈতিক দলগুলোর নিকট গ্রহণযোগ্য একজন নিরপেক্ষ ব্যক্তিকে উপরাষ্ট্রপতি পদে নিয়োগ দিয়ে সরকার পদত্যাগ করবেন।
২) অতঃপর নিয়োগপ্রাপ্ত উপরাষ্ট্রপতি দেশের ভারপ্রাপ্ত বা অস্থায়ী রাষ্ট্রপতির দায়িত্ব পালন করবেন এবং তার নেতৃত্বে গঠিত সরকার ৩ মাসের মধ্যে একটি সংসদ নির্বাচনের ব্যবস্থা করবেন।
৩) তত্ত্বাবধায়ক সরকার অবাধ, নিরপেক্ষ ও গ্রহণযোগ্য নির্বাচন পরিচালনা করবেন।
৪) তত্ত্বাবধায়ক সরকারের কোন সদস্য নির্বাচনে অংশ গ্রহণ করতে পারবে না।
৫) নির্বাচনোত্তর বিজয়ী দলের নিকট তত্ত্বাবধায়ক সরকার ক্ষমতা হস্তান্তর করবেন।

স্বৈরাচারী মনোভাব এবং ডা.মিলন হত্যাকাণ্ড

তত্ত্বাবধায়ক সরকারের রূপরেখা ঘোষণা ও সরকারের নিঃশর্ত পদত্যাগের দাবি চূড়ান্ত পর্যায়ে পৌঁছলে এরশাদ সরকার বিচলিত বোধ করে বটে; কিন্তু ক্ষমতায় টিকে থাকার মানসে স্বৈরাচারী মনোভাব প্রদর্শন করে। ১৯৯০ সালের ২৭ নভেম্বর বাংলাদেশ মেডিকেল এ্যাসোসিয়েশনের (বি.এম.এ)-এর নেতা ডা. শামসুল আলম মিলন আঁততায়ীর গুলিতে নিহত হলে সারা দেশ ক্ষোভে ফেটে পড়ে। পরিস্থিতি সরকারের নিয়ন্ত্রণের বাইরে চলে গেলে সরকার

দেশে জরুরি অবস্থা ও কারফিউ জারি করে। কিন্তু এতে জনগণের বিক্ষোভ ও আন্দোলন দমন করা আর সম্ভবপর হয়নি।

এরশাদ সরকারের পদত্যাগ, গণ অভ্যুত্থান ও এরশাদ সরকারে পদত্যাগ

এরশাদ সরকার যতোই স্বৈরাচারী মনোভাব প্রদর্শন করতে থাকে, ততোই আন্দোলন বিক্ষোভ তীব্র আকার ধারণ করে। ঢাকাসহ সমগ্র দেশ পরিণত হয় বিক্ষোভ ও মিছিলে। রাজনৈতিক আন্দোলনের সঙ্গে বিভিন্ন পেশাজীবী সংগঠন ও সাংস্কৃতিক কর্মীরা একাত্মতা ঘোষণা করে। ফলে রাজনৈতিক আন্দোলন রূপ নেয়া এক গণঅভ্যুত্থানে।

এরূপ অবরুদ্ধ ও গণআন্দোলনের চাপে এরশাদ সরকারের পতন অনিবার্য হয়ে ওঠে। অবশেষে ৪ ডিসেম্বর রাতে প্রেসিডেন্ট এরশাদ পদত্যাগের ঘোষণা দেন। তত্ত্বাবধায়ক সরকারের রূপরেখা অনুসারে বিরোধী জোট সুপ্রীম কোর্টের প্রধান বিচারপতি সাহাবুদ্দীন আহমদকে উপরাষ্ট্রপতি পদে মনোনয়ন দান করেন। ৬ ডিসেম্বর প্রেসিডেন্ট এরশাদ পদত্যাগ করে নবনিযুক্ত উপরাষ্ট্রপতি বিচারপতি সাহাবুদ্দীন আহমদ এর নিকট দায়িত্ব হস্তান্তর করেন।

এরশাদ সরকারের পতনের কারণ

এরশাদ সরকারের পতনের পেছনে রাজনৈতিক ও অর্থনৈতিক কারণ বিদ্যামান ছিল। এগুলির মধ্যে অন্যতম ছিল–

(১) ১৯৮২ সালের ২৪ মার্চ এরশাদ একটি নির্বাচিত সরকারকে ক্ষমতাচ্যুত করে সামরিক ক্ষমতাবলে দেশের শাসন ভার গ্রহণ করেন। ফলে প্রথম থেকেই জনগণ এই সরকারকে মেনে নিতে পারেনি।

(২) দেশে গণতন্ত্র ছিল না বিধায় সকল ক্ষমতার কেন্দ্রবিন্দু ছিল প্রেসিডেন্ট এরশাদ। তিনি ব্যক্তিগতভাবে সকল ক্ষমতা ব্যবহার করতেন। ফলে সরকার স্বৈচ্ছাচারির রূপ নেয়।

(৩) স্বৈরাচারী শাসন পাকাপোক্ত করার লক্ষ্যে এরশাদ প্রশাসনে একদল বাধ্যগত সামরিক কর্মকর্তাকে অধিক ক্ষমতা প্রদান করে। ফলে প্রশাসনে জবাবদিহিতার অভাব দেখা দেয়।

(৪) প্রেসিডেন্ট এরশাদের শাসনামলে প্রতিটি নির্বাচন ছিল অস্বচ্ছ ও প্রহসনমূলক। এ সকল নির্বাচনে কোন না কোন প্রধান রাজনৈতিক দল অংশ গ্রহণ করেনি। এর সকল প্রহসনমূলক নির্বাচন জনগণের আস্থা অর্জন করতে সক্ষম হয়নি।

প্রেসিডেন্ট এরশাদের দুর্নীতির কারণে দেশের অর্থনৈতিক সংকট দিনে দিনে বৃদ্ধি পেতে থাকে। সম্পদের প্রচুর অপচয় এবং কতিপয় ব্যক্তির হাতে সম্পদ পুঞ্জিভূত থাকায় জনগণের দুর্দশা চরমে পৌঁছে।

সার-সংক্ষেপ

১৯৮২ থেকে ১৯৯০ সাল পর্যন্ত দীর্ঘ নয় বছরের শাসনে জেনারেল এরশাদ দেশের উন্নয়নের নামে স্বৈরশাসন প্রতিষ্ঠা করেন। এরশাদের স্বৈরশাসন কখনো জন সমর্থন লাভ করেনি। ফলে গণ আন্দোলনের মুখে এরশাদ সরকারের পতন ঘটে।

পাঠোত্তর মূল্যায়ন ঃ ১১.৫

নৈর্ব্যক্তিক প্রশ্ন

১. ছাত্র সংগ্রাম পরিষদ গঠিত হয়–

ক) ১৯৯৩ খ্রিঃ খ) ১৯৮৩ খ্রিঃ
গ) ১৯৭৩ খ্রিঃ ঘ) ১৯৮৫ খ্রিঃ

২. ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয় কেন্দ্রীয় ছাত্র সংসদ (ডাকুস) নির্বাচন অনুষ্ঠিত হয়–

ক) ১৯৯০ খ্রিঃ খ) ১৯৯২ খ্রিঃ

গ) ১৯৮৯ খ্রিঃ ঘ) ১৯৯৩ খ্রিঃ

৩. সংবিধানের দশম সংশোধীন বিল পাশ হয়–
ক) ১২ জুন ১৯৯০ খ্রিঃ খ) ৩ জুন ১৯৯১ খ্রিঃ
গ) ১২ জুলাই ১৯৯০ খ্রিঃ ঘ) ১৪ জুন ১৯৯০ খ্রিঃ

৪. এরশাদ সরকারের পদত্যাগের পর অস্থায় রাষ্ট্রপতির দায়িত্ব গ্রহণ করেন–
ক) বিচারপতি সাত্তার খ) ড. কামাল হোসেন
গ) বিচারপতি সাহাবুদ্দীন আহমদ ঘ) বিচারপতি মোরশেদ

সংক্ষিপ্ত উত্তর প্রশ্ন

১. ১৯৯০ সালের ডাকসু নির্বাচনে কোন ছাত্র সংগঠন জয় লাভ করে?
২. তত্ত্বাবধায়ক সরকারের রূপরেখা কী ছিল?
৩. এরশাদ সরকারের পতনের ৪টি কারণ উল্লেখ করুন।

খালেদা জিয়ার ক্ষমতা লাভ : সংসদীয় ব্যবস্থায় উত্তরণ (১৯৯১ খ্রিঃ)

উদ্দেশ্য

এই পাঠ শেষে আপনি —

- অস্থায়ী ও নিরপেক্ষ সরকারের অধীনে পঞ্চম জাতীয় সংসদ নির্বাচন ও নির্বাচনের গুরুত্ব সম্পর্কে বিবরণ দিতে পারবেন।
- বেগম খালেদা জিয়ার নেতৃত্বে বিএনপির সরকার গঠন প্রক্রিয়া সম্বন্ধে বর্ণনা করতে পারবেন।
- সংবিধানের দ্বাদশ সংশোধনী ও সংসদীয় সরকার ব্যবস্থা সম্পর্কে বিবরণ দিতে পারবেন।
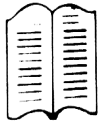
এরশাদ সরকারের পতনের মধ্য দিয়ে ১৯৯০ সালের ডিসেম্বর মাসে বিচারপতি সাহাবুদ্দীন আহমদ অস্থায়ী রাষ্ট্রপতির দায়িত্ব গ্রহণ করেন। তিনি ৯০ দিনের মধ্যে একটি অবাধ ও নিরপেক্ষ নির্বাচনের অঙ্গীকার করেন। সে মোতাবেক ১৯৯১ সালের ২৭ ফেব্রুয়ারি ধার্য করা হয় পঞ্চম জাতীয় সংসদ নির্বাচনের তারিখ।

উপদেষ্টা নিয়োগ, পঞ্চম জাতীয় সংসদ নির্বাচন ১৯৯১

অস্থায়ী রাষ্ট্রপতি বিচারপতি সাহাবুদ্দিন আহমদ সুষ্ঠু ও নিরপেক্ষ নির্বাচন পরিচালনার লক্ষে সুপ্রিমকোর্টের তিনজন বিচারপতির সমন্বয়ে একটি নিরপেক্ষ নির্বাচন কমিশন গঠন এবং তিন জোটের মনোনীত ব্যক্তিদের মধ্য হতে ১৭ জন উপদেষ্ট নিয়োগ করেন।

পূর্ব ঘোষণা অনুযায়ী ১৯৯১ সালের ২৭ এপ্রিল শান্তিপূর্ণভাবে অনুষ্ঠিত হয় পঞ্চম জাতীয় সংসদ নির্বাচন। নির্বাচনে তালিকাভুক্ত ভোটারের ছিল ৬ কোটি ২৩ লক্ষ। কিন্তু নির্বাচনে ভোটদান করে ৩ কোটি ৪৫ লক্ষ এবং প্রদত্ত ভোটের হার ৫৫.৩৫%। নির্বাচনে কোন দলই নিরঙ্কুশ সংখ্যাগরিষ্ঠতা অর্জন করতে পারেনি। কিন্তু বিএনপি শতকরা ৩০.৮০ টি ভোট পেয়ে ১৪০টি আসন লাভ করে একক সংখ্যাগরিষ্ঠ দল হিসেবে আর্বিভূত হয়। আওয়ামী লীগ শতকরা ৩০.০৮ ভোট পেলেও মাত্র ৮৮ টি আসনে জয়ী হয়। এ ছাড়া আওয়ামী লীগের

নেতৃত্বাধীন ৮ দলীয় জোটভুক্ত দলগুলি ১২টি আসন লাভ করে (৮৮+১২= ১০০)। শতকরা ১২ ভাগ ভোট পেয়ে ৩৫টি আসনে জয়ী হয়ে জাতীয় পার্টি সংসদে তৃতীয় বৃহত্তম দলে পরিণত হয়।

পঞ্চম সংসদ নির্বাচনের গুরুত্ব

বাংলাদেশের সংসদীয় রাজনীতির ইতিহাসে পঞ্চম জাতীয় সংসদ নির্বাচন বিভিন্ন কারণে বিগত নির্বাচনের চেয়ে বৈশিষ্ট্যপূর্ণ–

প্রথমত, স্বাধীনতা-উত্তর একমাত্র পঞ্চম জাতীয় সংসদ নির্বাচনটি পরিচালিত হয় একটি নিরপেক্ষ অর্ন্তবর্তীকালীন সরকারের অধীনে। ফলে নির্বাচনী ফলাফলে দলীয় কোন প্রভাব পড়েনি।

দ্বিতীয়ত, এ নির্বাচনে সকল দল ও জনগণের অংশগ্রহণ ছিল অবাধ ও স্বতঃর্স্ফূত।

তৃতীয়ত, সরেজমিনে নির্বাচন পর্যবেক্ষণ করার জন্য এই প্রথম বিদেশী পর্যবেক্ষকদের আমন্ত্রণ জানানো হয়। নির্বাচনোত্তর বিদেশী পর্যবেক্ষকগণ এই নির্বাচন অবাধ ও নিরপেক্ষ হয়েছে বলে প্রশংসা করেন।

চতুর্থত, এই নির্বাচনে মহিলা ভোটার ও প্রার্থীর সংখ্যা ছিল উল্লেখ্যযোগ্য । বিশেষত, আওয়ামী লীগ ও বিএনপি দলের দুই প্রধান ছিলেন মহিলা।

পঞ্চমত, সর্বোপরি পঞ্চম জাতীয় সংসদ নির্বাচনে জনগণ অপূর্ব ধৈর্য ও সহনশীলতার পরিচয় দেয় এই নির্বচন ছিল ১৯৯০ সালের গণঅভ্যুত্থানের প্রেক্ষাপটে গণতন্ত্র রক্ষার ঐক্যবদ্ধ সংকল্পের ফসল।

বেগম খালেদা জিয়ার নেতৃত্বে বিএনপি সরকার গঠন

নির্বাচনী ফলাফলে কোন দলই নিরঙ্কুশ সংখ্যাগরিষ্ঠতা অর্জন করতে সক্ষম হয়নি। ফলে সরকার গঠন নিয়ে প্রথম দিকে অনিশ্চয়তা দেখা দেয়। অবশেষে ২০টি আসনে জয়ী বাংলাদেশ জামায়ত-ই-ইসলামী বিএনপিকে সমর্থন দানের প্রতিশ্রুতি দিলে অস্থায়ী রাষ্ট্রপতি বিচারপতি সাহাবুদ্দীন আহমদ ১৯ মার্চ (১৯৯১) সংখ্যাগরিষ্ঠ দলের নেতা বেগম খালেদা জিয়াকে সরকার গঠনের আহবান জানান। ২০ মার্চ বাংলাদেশের প্রথম মহিলা প্রধানমন্ত্রী হিসেবে শপথ গ্রহণ করেন বিএনপি প্রধান বেগম খালেদা জিয়া। প্রধানমন্ত্রী প্রথমেই ১১ জন মন্ত্রী এবং ২১ জন প্রতিমন্ত্রী সহ ৩০ সদস্যের একটি মন্ত্রীপরিষদ গঠন করেন।

সংবিধানের দ্বাদশ সংশোধনী ও সংসদীয় গণতন্ত্রে উত্তরণ

১৯৯১ সালের ৫ এপ্রিল অস্থায়ী রাষ্ট্রপতি বিচারপতি সাহাবুদ্দীন আহমদ নব নির্বাচিত জাতীয় সংসদের প্রথম অধিবেশন আহবান করেন। ১৪ এপ্রিল আওয়ামী লীগ সদস্য ও বিরোধী দলীয় উপনেতা আব্দুস সামাদ আজাদ সংসদীয় সরকার পদ্ধতি পুনঃপ্রবর্তন ও অস্থায়ী রাষ্ট্রপতি কর্তৃক ক্ষমতা হস্তান্তরের পদ্ধতি সংবলিত একটি বিল সংসদে উত্থাপনের নোটিশ দেন। অন্যান্য বিরোধী দলের সদস্য সংশোধনের মাধ্যমে সংসদীয় পদ্ধতি প্রবর্তনের পক্ষে মতামত প্রদান করে।

সংসদে সংসদীয় সরকার পদ্ধতি বিল পাস

১৯৯১ সালের ১১ জুন জাতীয় সংসদের অধিবেশন পুনরায় বসে। ইতোমধ্যে বিএনপি দলীয় সভায় সংসদীয় পদ্ধতি প্রবর্তনের পক্ষে সিদ্ধান্ত গৃহীত হয়। সরকারী এবং বিরোধী দলের মধ্যে বিশদ আলোচনার মধ্যে দিয়ে সংবিধান সম্পর্কে ঐকমত্যে পৌঁছাতে সক্ষম হয়। আইনমন্ত্রী মির্জা গোলাম হাফিজ সংবিধানের একাদশ ও দ্বাদশ সংশোধনী বিল নামে দুটি বিল সংসদে পেশ (২৮ জুলাই ১৯৯১) করেন। ৬ আগস্ট কোন বিরোধিতা ছাড়াই জাতীয় সংসদে একাদশ ও দ্বাদশ সংশোধনী বিল গৃহীত হয়। একাদশ সংশোধনীর উদ্দেশ্য ছিল, উপ-রাষ্ট্রপতি হিসেবে তার পূর্বপদে প্রত্যাবর্তনের ব্যবস্থা করা। ১৮ সেপ্টেম্বর অস্থায়ী রাষ্ট্রপতি উভয় বিলে সম্মতি (স্বাক্ষর) প্রদান করেন। পরদিন ১৯ সেপ্টেম্বর নতুন সংসদীয় সরকারের প্রধান হিসেবে প্রধানমন্ত্রী খালেদা জিয়া পুনরায় শপথ গ্রহণ করেন।

সংবিধানের দ্বাদশ সংশোধনীর বৈশিষ্ট্য

সংবিধানের দ্বাদশ সংশোধনীর মূল উদ্দেশ্য ও লক্ষ্য ছিল বিদ্যমান রাষ্ট্রপতি সরকার পদ্ধতির পরিবর্তে দেশে সংসদীয় সরকার পদ্ধতি বা মন্ত্রিপরিষদ শাসিত সরকার পদ্ধতি প্রবর্তন করা । দ্বাদশ সংশোধনীর দ্বারা আনীত বৈশিষ্ট্য সমূহ হলো–

(১) বর্তমানে বাংলাদেশে একজন রাষ্ট্রপতি থাকবেন। তিনি আইন অনুযায়ী সংসদ সদস্যকৃর্তক নির্বাচিত হবেন।
(২) রাষ্ট্রপতি সংবিধান লংঘন বা গুরুতর অসদাচরণের কারণে জাতীয় সংসদের দুই তৃতীয়াংশ ভোটে তাঁকে অপসারণ করা যাবে।
(৩) রাষ্ট্রপতি প্রধানমন্ত্রীর পরামর্শক্রমে জাতীয় সংসদের অধিবেশন আহবান করবেন এবং প্রয়োজনে স্থগিত বা ভেঙ্গে দিতে পারবেন।
(৪) সংসদের সংখ্যাগরিষ্ঠদলের নেতাকে প্রধানমন্ত্রীর দায়িত্ব গ্রহণ করার জন্য রাষ্ট্রপতি আহবান জানাবেন এবং রাষ্ট্রপতির নিকট প্রধানমন্ত্রী শপথ গ্রহণ করবেন।
(৫) প্রধানমন্ত্রী সরকার প্রধান হিসেবে সকল নির্বাহী দায়িত্ব পালন করবেন। তিনি সকল অবস্থায় রাষ্ট্রপতি ও মন্ত্রিসভার মধ্যে যোগসূত্র স্থাপন করবেন।
(৬) প্রধানমন্ত্রী জাতীয় সংসদের নেতা ও রক্ষক। তাঁর স্থায়ীত্বের ওপর জাতীয় সংসদের মন্ত্রিসভার স্থায়ীত্ব নির্ভর করবে।
(৭) সংখ্যাগরিষ্ঠ সদস্যের আস্থা হারালে প্রধানমন্ত্রী পদত্যাগ করবেন বা সংসদ ভেঙ্গে দিতে রাষ্ট্রপতিকে পরামর্শ দান করবেন। প্রকৃতপক্ষে বর্তমান সংবিধানে দেশের প্রকৃত নির্বাহী ক্ষমতা (Real Executive) প্রধানমন্ত্রীর হাতে ন্যস্ত। তিনিই বাংলাদেশের মূল বা প্রধান শাসনকর্তা।

আব্দুর রহমান বিশ্বাস রাষ্ট্রপতি নির্বাচিত, রাষ্ট্রপতি নির্বাচন ১৯৯১

সংবিধানের দ্বাদশ সংশোধনী পাস হওয়ার পর নতুন পদ্ধতিতে রাষ্ট্রপতি নির্বাচনের প্রয়োজনীয়তা দেখা দেয়। ১৯৯১ সালের ৮ অক্টোবর ‘সংসদীয় পদ্ধতির অধীনে রাষ্ট্রপতি নির্বাচন অনুষ্ঠিত হয়। সংসদ সদস্যদের গোপন ভোটে বিএনপি মনোনীত প্রার্থী আব্দুর রহমান বিশ্বাস রাষ্ট্রপতি নির্বাচিত হন। তিনি আওয়ামী লীগ প্রার্থী বিচারপতি বদরুল হায়দার চৌধুরীকে ১৭২-৯২ ভোটের ব্যবধানে পরাজিত করেন। রাষ্ট্রপতি নির্বাচনে ২৬৪ জন সংসদ সদস্য অংশ গ্রহণ করেন।

বিচারপতি সাহাবুদ্দীন আহমদ প্রধান বিচারপতির পদে প্রত্যাবর্তন ও খালেদা জিয়ার সরকার

আব্দুর রহমান বিশ্বাস ১৯৯১ সালের ৯ অক্টোবর আনুষ্ঠানিকভাবে দ্বাদশ রাষ্ট্রপতির দায়িত্বভার গ্রহণ করেন। ১০ অক্টোবর বিচারপতি সাহাবুদ্দিন আহমদ অস্থায়ী রাষ্ট্রপতির পদ থেকে প্রধান বিচারপতির পদে প্রত্যাবর্তন করেন। এভাবে বেগম খালেদা জিয়ার ক্ষমতা গ্রহণের মধ্য দিয়ে দেশে সংসদীয় পদ্ধতি সরকার ব্যবস্থা চালু হয়। খালেদা জিয়ার নেতৃত্বে এই সরকার ১৯৯৫ সাল পর্যন্ত দেশ শাসন করে।

সার-সংক্ষেপ

১৯৭২ সালে গৃহীত স্বাধীন বাংলাদেশের সংবিধানে সংসদীয় সরকার ব্যবস্থা প্রবর্তিত হয়। কিন্তু ১৯৭৫ সালে চতুর্থ সংশোধনীর পর রাষ্ট্রপতি ব্যবস্থা প্রতিষ্ঠা করা হয়। দীর্ঘ ১৫ বছর পর ১৯৯১ সালে সংখ্যাগরিষ্ঠ আসন লাভকারী বিএনপি এবং দ্বিতীয় স্থান অধিকারী আওয়ামী লীগের প্রচেষ্টায় সকল দলের ঐকমত্যের ভিত্তিতে সংসদীয় পদ্ধতির শাসন চালু হয়। তখন থেকে অদ্যাবধি সংসদীয় সরকার ব্যবস্থা বাংলাদেশে বিদ্যামান রয়েছে।

পাঠোত্তর মূল্যায়ন ঃ ১১.৬

নৈর্ব্যক্তিক প্রশ্ন

১. ১৯১১ সালের জাতীয় সংসদ নির্বাচনে সংখ্যাগরিষ্ঠ আসন লাভ করে–
ক) জাতীয় পার্টি
খ) বাংলাদেশ জাতীয়তাবাদী দল
গ) বাংলাদেশ আওয়ামী লীগ
ঘ) বাংলাদেশ জামায়াত-ই-ইসলামী

২. ১৯৯১ সালে অনুষ্ঠিত জাতীয় সংসদ নির্বাচন বাংলাদেশের–
ক) চতুর্থ জাতীয় সংসদ নির্বাচন
খ) পঞ্চম জাতীয় সংসদ নির্বাচন
গ) ষষ্ঠ জাতীয় সংসদ নির্বাচন
ঘ) তৃতীয় জাতীয় সংসদ নির্বাচন

৩. বাংলাদেশে সংসদীয় সরকার ব্যবস্থা পুনরায় প্রতিষ্ঠিত হয়–
ক) সংবিধানের পঞ্চম সংশোধীর মাধ্যমে
খ) সংবিধানের সপ্তম সংশোধীর মাধ্যমে
গ) সংবিধানের একাদশ সংশোধীর মাধ্যমে
ঘ) সংবিধানের দ্বাদশ সংশোধীর মাধ্যমে

৪. বাংলাদেশের রাষ্ট্রপতি নির্বাচিত হন–
ক) জনগণের ভোটে
খ) সংসদ সদস্যদের ভোটে
গ) বিচারপতিদের ভোটে
ঘ) পৌরসভার চেয়ারম্যানদের ভোটে

সংক্ষিপ্ত-প্রশ্ন উত্তর

১. পঞ্চম জাতীয় সংসদ নির্বাচনে বিএনপি শতকরা কত ভোট এবং কয়টি আসন লাভ করে?
২. পঞ্চম জাতীয় নির্বাচন ইতিহাসে কেন শুরুত্বপূর্ণ।
৩. সংবিধানের দ্বাদশ সংশোধনীর মুখ্য উদ্দেশ্য ও লক্ষ্য কী ছিল?
৪. সংবিধানের একাদশ সংশোধনীর উদ্দেশ্য কী ছিল?

তত্ত্বাবধায়ক সরকার ব্যবস্থা, সংসদ নির্বাচন ১৯৯৬ ও শেখ হাসিনার সরকার গঠন

উদ্দেশ্য

এই পাঠ শেষে আপনি —

- তত্ত্বাধায়ক সরকার সম্পর্কে বর্ণনা করতে পাবেন।
- তত্ত্বাধায়ক সরকার ব্যবস্থা অধীনে অনুষ্ঠিত সপ্তম জাতীয় সংসদ নির্বাচন সম্পর্কে বিবরণ দিতে পারবেন।
- ১৯৯৬ সালে নির্বাচিত শেখ হাসিনা সরকারের কার্যক্রম সম্পর্কে বিশদ বিশ্লেষণ করতে পারবেন।

নির্দলীয় ও অস্থায়ী সরকার, তত্ত্বাবধায়ক সরকার ব্যবস্থা কী

তত্ত্বাবধায়ক সরকার একটি অস্থায়ী ও বিশেষধরণের সরকার পদ্ধতি। বিশেষ রাজনৈতিক সংকটজনক পরিস্থিতি ছাড়া এ ধরণের সরকার ব্যবস্থা পরিলক্ষিত হয় না। এই সরকারের মূল দায়িত্ব ও উদ্দেশ্য হলো একটি সুষ্ঠু নিরপেক্ষ ও গ্রহণযোগ্য নির্বাচন পরিচালনা করে সংখ্যাগরিষ্ঠ দলের হাতে ক্ষমতা অর্পণ করা।

ষষ্ঠ জাতীয় সংসদ নির্বাচন, তত্ত্বাবাধয়ক সরকার গঠনের পটভূমি

১৯৯০ সালে এরশাদ সরকারের পতন ও পদত্যাগের সময় যে সাংবিধানিক সংকট সৃষ্টি হয়-তা নিরসেন এইরূপ একটি অস্থায়ী সরকার গঠন অনিবার্য হয়ে ওঠে। তৎকালীন সরকার বিরোধী জোটের রূপরেখা অনুযায়ী প্রধান বিচারপতি সাহাবুদ্দিন আহমদের নেতৃত্বে অর্ন্তবর্তীকালীন সরকার গঠন করা হয়েছিল। ১৯৯১ সালের পঞ্চম জাতীয় সংসদ নির্বাচনের পর তখনকার মতো এই সরকারের পর্ব সমাপ্ত হয়ে যায় । কিন্তু খালেদা জিয়ার নেতৃত্বে বিএনপি সরকার ক্ষমতা থাকাকালীন (১৯৯১-৯৫) বিরোধী দল কতকগুলি দাবিকে সামনে রেখে সরকারের পদত্যাগ দাবি করে এবং একই সঙ্গে পরবর্তী নির্বাচন নির্দলীয় তত্ত্বাবধায়ক সরকারের অধীনে পরিচালনার দাবি জানায়। কিন্তু সরকার তত্ত্বাবধায়ক সরকারের দাবি অসাংবিধানিক বলে অগ্রাহ্য করে এবং ১৯৯৬ সালের ১৫ ফেব্রুয়ারি ষষ্ঠ জাতীয় সংসদ নির্বাচন ঘোষণা করে। কিন্তু সকল দল নির্বাচন বর্জনের পাশাপাশি তা প্রতিহত করারও ঘোষণা দেয়। বিরোধী দল নির্বাচনে অংশ গ্রহণ না করায় এই নির্বাচন জনগণের নিকট গ্রহণ যোগ্যতা অর্জন করেনি। ফলে উদ্ভুত গণআন্দোলনের চাপে সরকার ১৯৯৬ সালের ২৬ মার্চ সংবিধানের ত্রয়োদশ সংশোধনীর মাধ্যমে “তত্ত্বাবধায়ক সরকার” গঠন আইন পাশ করে। (তত্ত্বাবধায়ক সরকার ব্যবস্থা বর্তমানে বিলুপ্ত)

বিচারপতি হাবিবুর রহমান প্রধান উপদেষ্টা নিয়োগ, সপ্তম জাতীয় সংসদ নির্বাচন

সংবিধানের ত্রয়োদশ সংশোধনীর মাধ্যমে তত্ত্বাবধায়ক সরকার ব্যবস্থা গৃহিত হয়। অতঃপর তত্ত্বাবধায়ক সরকারের নিকট ক্ষমতা অর্পণ করে বিএনপি সরকার পদত্যাগ করে। প্রধান উপদেষ্টা বিচারপতি হাবিবুর রহমান নির্দলীয় বিশিষ্ট ব্যক্তিদের সমন্বয়ে একটি উপদেষ্টা পরিষদ গঠন করেন। তিনি ১৯৯৬ সালের ১২ জুন জাতীয় সংসদের নির্বাচনের তারিখ ঘোষণা করেন। তত্ত্বাবধায়ক সরকার সংসদ নির্বাচন পর্যবেক্ষণ করার জন্য ইউরোপীয় ইউনিয়ন, সার্ক ফোরাম, কমনওয়েলথসহ কয়েকটি দেশের প্রতিনিধিদের আমন্ত্রণ জানায়। অবশেষে বিপুল উৎসাহ ও উদ্দীপনা মধ্য দিয়ে ১২ জুন (১৯৯৬) সপ্তম জাতীয় সংসদ নির্বাচন অনুষ্ঠিত হয়।

আওয়ামী লীগের একক সংখ্যা গরিষ্ঠতা লাভ

সপ্তম জাতীয় সংসদ নির্বাচনে কোনো দল নিরঙ্কুশ সংখ্যাগরিষ্ঠতা অর্জন করতে পারেনি। জাতীয় সংসদ নির্বাচনে ৩০০টি আসনের মধ্যে আওয়ামী লীগ ১৪৬টি আসন লাভ করে একক সংখ্যাগরিষ্ঠতা অর্জন করে। বিএনপি ১১৬টি, জাতীয় পার্টি ৩২ এবং জামায়াতে ইসলামী ৩টি আসনে জয়লাভ করে। কয়েকজন স্বতন্ত্র প্রার্থীর যোগদানের মধ্য দিয়ে আওয়ামী লীগ প্রধান শেখ হাসিনার নেতৃত্বে ১৯৯৬ সালের ২৩ জুন সরকার গঠিত হয়। শেখ হাসিনা প্রধানমন্ত্রির দায়িত্ব গ্রহণ করেন। জাতীয় পার্টি ও জাসদ হাসিনা সরকারের যোগ দিলে একে ঐকমত্যের সরকার নাম দেয়া হয়।

শেখ হাসিনার নেতৃত্বাধীন আওয়ামী লীগ সরকারের কার্যক্রম

আওয়ামী লীগ সরকার ১৯৯৬ সালের ২৩ জুন সরকার গঠনের পর থেকে পূর্ণ মেয়াদ (৫ বছর) ক্ষমতায় ছিল। ১৯৯৬ থেকে ২০০১ সাল পর্যন্ত শাসনামলে আওয়ামী লীগ সরকারের অন্যতম কার্যক্রম ছিল "ইনডিমনিটি অধ্যাদেশ বাতিল" ভারতের সঙ্গে "গঙ্গার (ফারাক্কা) পানি বণ্টন চুক্তি" এবং "পাবর্ত্য চট্টগ্রাম শান্তি চুক্তি"।

ফারাক্কার বাঁধ বাংলাদেশের সমস্যা, গঙ্গা পানিচুক্তি বণ্টন

বাংলাদেশ ও প্রতিবেশি ভারতের মধ্যে অসম পানিবণ্টন ব্যবস্থা নিয়ে দীর্ঘ দিনের এক সমস্যা বিদ্যমান ছিল। বাংলাদেশ ভাটির দেশ বলে প্রয়োজনীয় সময় পানি প্রাপ্তির দিকে থেকে বঞ্চিত ছিল। বিশেষ করে ভারত পশ্চিম বঙ্গে গঙ্গানদীর ওপর ফারাক্কা বাধ নির্মাণ করায় শুষ্ক মৌসুমে বাংলাদেশের পদ্মা ও যমুনা নদীর পানি প্রবাহ সীমিত হয়ে যায়। এ সমস্যা নিরসন কল্পে আওয়ামী লীগ সরকার ভারত সরকারের সঙ্গে এক সমঝোতায় উপনীত হয় এবং বাংলাদেশ-ভারত ৩০ বছর মেয়াদী গঙ্গাপানি চুক্তি স্বাক্ষর করে।

পাবর্ত্য চট্টগ্রাম শান্তিচুক্তি

১৯৭২ সালে স্বাধীনতা লাভের পর থেকে পার্বত্য চট্রগ্রামের আদিবাসীরা স্বায়ত্তশাসনসহ কতিপয় দাবিদাওয়া আদায়ের লক্ষ্যে আন্দোলন শুরু করে। তাদের আন্দোলন এক পর্যায়ে সশস্ত্র যুদ্ধে রূপ নেয়। আদিবাসীরা "শান্তিবাহিনী" নামে একটি সশস্ত্র বাহিনী গঠন করে পার্বত্য এলাকায় অস্থিতিশীল পরিস্থিতির সৃষ্টি করে। আওয়ামী লীগ সরকার এই অবস্থার স্থায়ী সমাধানের লক্ষ্যে ১৪ সদস্য বিশিষ্ট একটি কমিটি গঠন করে এবং আদিবাসীর সংগঠন "পার্বত্য চট্টগ্রাম জনসংহতি সমিতির" সঙ্গে যোগাযোগ করে। শান্তি প্রতিষ্ঠার উদ্দেশ্যে উভয় দল কয়েকটি বৈঠকে মিলিত হয়। অবশেষে ১৯৯৭ সালের ২ ডিসেম্বর ঐতিহাসিক শান্তি চুক্তি স্বাক্ষরিত হয়। এই চুক্তির ফলে শান্তি বাহিনীর সশস্ত্র ক্যাডাররা সরকারের নিকট আনুষ্ঠানিকভাবে অস্ত্র জমাদান সম্পন্ন করে এবং স্বাভাবিক জীবনে ফিরে আসে। শান্তি চুক্তির ৪টি অংশ রয়েছে– (ক) সাধারণ (খ) পার্বত্য চট্টগ্রাম জেলার স্থানীয় সরকার পরিষদ, (গ) পার্বত্য চট্টগ্রাম বিভাগীয় পরিষদ (ঘ) আদিবাসীদের পুর্নবাসন, সাধারণ ক্ষমা ও অন্যান্য বিষয়াদি।

সার-সংক্ষেপ

একটি বিশেষ পরিস্থিতে তত্ত্বাবধায়ক সরকার ব্যবস্থা গ্রহণ করা হলেও তা অগণতান্ত্রিক একটি ব্যবস্থা হওয়া সংবিধান থেকে বিলুপ্ত হয়েছে। তবে, তত্ত্বাবধায়ক সরকারের অধীনে সুষ্ঠুভাবে সংসদীয় নির্বাচন অনুষ্ঠিত হয়।

পাঠোত্তর মূল্যায়ন ঃ ১১.৭

নৈর্ব্যক্তিক প্রশ্ন

১. তত্ত্বাবধায়ক সরকার একটি-
ক) গণতান্ত্রিক সরকার খ) নির্দলীয় ও অন্তবর্তীকালীন সরকার
গ) সংসদীয় সরকার ঘ) রাষ্ট্রপতি শাসিত সরকার

২. তত্ত্বাবধায়ক সরকার আইন সংবিধানে গৃহীত হয়-
ক) এয়োদশ সংশোধনীর মাধ্যমে খ) পঞ্চম সংশোধনীর মাধ্যমে
গ) দ্বাদশ সংশোধনীর মাধ্যমে ঘ) দশম সংশোধনীর মাধ্যমে

৩. ১৯৯৫ সালে তত্ত্বাবধায়ক সরকারের প্রধান উপদেষ্টা ছিলেন-
ক) বিচারপতি সাহাবুদ্দীন আহম্মদ খ) বিচারপতি লতিফুর রহমান
গ) বিচারপতি হাবিবুর রহমান ঘ) বিচারপতি সায়েম

৪. সপ্তম জাতীয় সংসদ নির্বাচনে একক সংখ্যাগরিষ্ঠ আসন লাভ করে-
ক) আওয়ামী লীগ খ) বিএনপি
গ) জাতীয় পার্টি ঘ) গণফোরাম

সংক্ষিপ্ত উত্তর প্রশ্ন

১.তত্ত্বাবধায়ক সরকার ব্যবস্থা কী?
২. ৭ম জাতীয় সংসদ নির্বাচনে আওয়ামী লীগ কয়টি আসন লাভ করে?
৩. পার্বত্য চট্টগ্রাম শান্তি চুক্তির ৪টি অংশ কী?

অষ্টম জাতীয় সংসদ নির্বাচন ও ২০০১ খালেদা জিয়ার সরকার গঠন

উদ্দেশ্য

এই পাঠ শেষে আপনি —

- তত্ত্বাবধায়ক সরকারের অধীনে অনুষ্ঠিত ৮ম জাতীয় সংসদ নির্বাচন সম্পর্কে বর্ণনা করতে পারবেন।
- ৮ম জাতীয় সংসদ নির্বাচনে বিজয়ী খালেদা জিয়ার সরকার গঠন সম্পর্কে বিবরণ দিতে পারবেন।
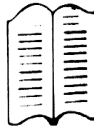
লতিফুর রহমান তত্ত্বাবধায়ক সরকারের প্রধান উপদেষ্টা নিযুক্ত, সুষ্ঠু নির্বাচনের পরিবেশ নিশ্চিতকরণ, বিচারপতি লতিফুর রহমানের নেতৃত্বে তত্ত্বাবধায়ক সরকার গঠন

আওয়ামী লীগ সরকার পাঁচ বছর (১৯৯৬-২০০১) মেয়াদে বাংলাদেশের শাসন ব্যবস্থা পরিচালনা করে। অতঃপর সংবিধান মোতাবেক ২০০১ সালের ১৬ জুলাই সুপ্রিম কোর্টের অবসর প্রাপ্ত প্রধান বিচারপতি লতিফুর রহমানের নেতৃত্বে গঠিত হয় তত্ত্বাবধায়ক সরকার। তত্ত্বাবধায়ক সরকার অষ্টম জাতীয় সংসদ নির্বিঘ্নে সম্পন্ন করার লক্ষ্যে কতিপয় পদক্ষেপ গ্রহণ করে।

প্রথমত, অবৈধ অস্ত্র উদ্ধার;
দ্বিতীয়ত, সন্ত্রাস দমনে সেনাবাহিনী প্রয়োগ,
তৃতীয়ত, গুরুত্বপূর্ণ প্রশাসনিক রদবদল,
চতুর্থত, ভোটার তালিকা সংশোধন,

পঞ্চমত, ঋণখেলাপীদের নির্বাচনে অংশ গ্রহণে নিষেধাজ্ঞা এবং
ষষ্ঠত, বেতার ও টিভিকে নিরপেক্ষ প্রচার মাধ্যমে পরিণত করা। ইতোমধ্যে তত্ত্বাবধায়ক সরকার ২০০১ সালের ১ অক্টোবর অষ্টম জাতীয় সংসদ নির্বাচনের তারিখ ধার্য করে।

বিএনপির নির্বাচনী জোট গঠন, ২০০১ সালের জাতীয় সংসদ নির্বাচন

সরকার কর্তৃক নির্বাচনের তারিখ ঘোষণার সঙ্গে সঙ্গে রাজনৈতিক অঙ্গনে নির্বাচনী প্রচারণার জোর তৎপরতা শুরু হয়। এ নির্বাচনের প্রায় ৭ কোটি ভোটার নাম রেজিস্ট্রি করে এবং প্রায় ৩০ হাজার ভোট কেন্দ্র স্থাপন করা হয়। নির্বাচন পর্যবেক্ষণ করার প্রায় ১০০ জন বিদেশী পর্যবেক্ষককে দেশে আমন্ত্রণ জানানো হয়।

ঐক্য জোটের সংখ্যাগরিষ্ঠতা অর্জন এবং সরকার গঠন

জাতীয় নির্বাচনে আওয়ামী লীগ এককভাবে অংশ গ্রহণ করে। কিন্তু প্রধান প্রতিদ্বন্দ্বী বিএনপি সমমনা তিনটি রাজনৈতিক দল নিয়ে ঐক্য জোট গঠন করে এবং জোটবদ্ধভাবে নির্বাচনে প্রতিদ্বন্দ্বিতা করে। এ সকল দল ছিল বাংলাদেশ জামায়াতে ইসলামী, ইসলামী ঐক্যজোট এবং নাজিউর রহমান মঞ্জুর নেতৃত্বাধীন জাতীয় পার্টির একাংশ। ২০০১ সালের ১ অক্টোবর অষ্টম জাতীয় সংসদ নির্বাচন অনুষ্ঠিত হয় এবং শান্তিপূর্ণভাবে নির্বাচন সম্পন্ন হয়। নির্বাচনে বিএনপির নেতৃত্বে চারদলীয় জোট ২১৪টি আসন পেয়ে সংখ্যাগরিষ্ঠতা অর্জন করে। তবে দলীয়ভাবে বিএনপি ১৯১টি আসনে জয়ী হয় বা মোট আসনের শতকরা ৬৬.১০ ভাগ। আওয়ামী লীগ ৬২টি আসনে জয়লাভ করে মোট আসনের শতকরা ২০.৮০ ভাগ। নির্বাচনে জাতীয় পার্টি (এরশাদ) ১৪টি, কৃষক শ্রমিক জনতালীগ ১টি, জাতীয় পার্টি (মঞ্জু) ১টি এবং স্বতন্ত্র প্রার্থীরা ৬টি আসল লাভ করে।

চারদলীয় ঐক্যজোট বিজয়ের পর ২০০১ সালের ১০ অক্টোবর খালেদা জিয়ার নেতৃত্বে জোট সরকার গঠিত হয়। বেগম জিয়া তৃতীয় বারের মতো বাংলাদেশের প্রধানমন্ত্রির দায়িত্ব গ্রহণ করেন। অতঃপর বিচারপতি লতিফুর রহমানের নেতৃত্বে গঠিত তত্ত্বাবধায়ক সরকার পদত্যাগ করেন।

চারদলীয় জোট সরকারের কিছু উল্লেখযোগ্য পদক্ষেপ

খালেদা জিয়া নেতৃত্বে জোট সরকারের কয়েকটি উল্লেখযোগ্য পদক্ষেপের মধ্যে নারী শিক্ষা উন্নয়নের লক্ষ্যে দ্বাদশ শ্রেণি পর্যন্ত নারী শিক্ষা অবৈতনিক ও উপবৃত্তি প্রকল্প চালু। আইন শৃঙ্খলা পরিস্থিতি উন্নয়নের জন্য 'র‍্যাপিড একশন ব্যাটেলিয়ন' (র‍্যাব) চালু, জনস্বাস্থ্য উন্নয়ন প্রকল্প এবং পরিবেশ উন্নয়নের জন্য সিএনজি চালিত যানবাহন চালু ও পলিথিন ব্যাগ নিষিদ্ধ করণের উদ্যোগ উল্লেখযোগ্য। ২০০৬ সালের অক্টোবর মাসে এ সরকারের মেয়াদ শেষ হয়।

সার-সংক্ষেপ

২০০১ সালে তত্ত্বাবধায়ক সরকারের অধীনে অষ্টম জাতীয় সংসদ নির্বাচনের মাধ্যমে চারদলীয় জোট ক্ষমতায় আসে। বিএনপি প্রধান বেগম খালেদা জিয়া তৃতীয় বারের মতো প্রধানমন্ত্রির দায়িত্বভার গ্রহণ করেন। ২০০৬ সালে এ সরকারের মেয়াদ শেষ হয়।

পাঠোত্তর মূল্যায়ন ঃ ১১.৮

নৈর্ব্যক্তিক প্রশ্ন

১. ২০০১ সালের তত্ত্বাবধায়ক সরকারের প্রধান উপদেষ্টা ছিলেন–
   ক) বিচারপতি আব্দুস সাত্তার খ) বিচারপতি হাবিবুর রহমান
   গ) বিচারপতি গোলাম রব্বানী ঘ) বিচারপতি লতিফুর রহমান

২. ৮ম জাতীয় সংসদ নির্বাচন অনুষ্ঠিত হয়–
   ক) ২০০১ সালের ১ অক্টোবর খ) ২০০২ সালের ১ নভেম্বর
   গ) ২০০২ সালের ১ অক্টোবর ঘ) ২০০১ সালের ১৮ অক্টোবর
৩. ২০০১ সালের সংসদ নির্বাচনে সংখ্যাগরিষ্ঠতা অর্জন করে–
   ক) জাতীয় পার্টি খ) জামায়াত-ই-ইসলামী
   গ) আওয়ামী লীগ ঘ) বিএনপি
৪. খালেদা জিয়ার সরকার একটি–
   ক) একদলীয় সরকার খ) জোট সরকার
   গ) ইসলামিক সরকার ঘ) ক্যামুনিস্ট সরকার

সংক্ষিপ্ত-উত্তর প্রশ্ন

১. ২০০১ সালে তত্ত্বাবধায়ক সরকার নির্বাচন নির্বিঘ্নে করার লক্ষ্যে কী কী পদক্ষেপ গ্রহণ করেন।
২. বিএনপি সরকারে সঙ্গে জোটবদ্ধ অন্যান্য দলের নাম লিখুন।
৩. খালেদা জিয়া সরকারের দুটি উল্লেখ্যযোগ্য কার্যক্রম আলোচনা করুন।

বিশদ-উত্তর প্রশ্ন

১. স্বাধীন বাংলাদেশে প্রথম গণপরিষদ কখন এবং কাদের নিয়ে গঠিত হয়?
২. ১৯৭২ সালে প্রণীত সংবিধানের বৈশিষ্টগুলি বর্ণনা করুন।
৩. সংবিধানের চতুর্থ সংশোধনীর উদ্দেশ্য বর্ণনা করুন।
৪. ১৯৭২-৭৫ সময়কালে আওয়ামী লীগ সরকারের কার্যক্রম বা সাফল্য বর্ণনা করুন।
৫. সামরিক সরকারের বৈশিষ্ট্যসমূহ বর্ণনা করুন।
৬. এরশাদ সরকারের পতনের কারণগুলির বিবরণ দিন।
৭. তত্ত্বাবধায়ক সরকারের অধীন অনুষ্ঠিত পঞ্চম জাতীয় সংসদের গুরুত্ব ব্যাখ্যা করুন।
৮. দ্বাদশ সংশোধনীর উল্লেখযোগ্য বৈশিষ্টগুলি বর্ণনা করুন।
৯. শেখ হাসিনা সরকারের আমলে পাবর্ত্য চট্টগ্রাম শান্তি চুক্তির বিবরণ দিন।
১০. অষ্টম জাতীয় সংসদ নির্বাচন ও চারদলী জোটের ক্ষমতা লাভের প্রেক্ষাপট বর্ণনা করুন।